KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : তিমির চক্রবর্তী ?
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5 7 8 17	Year of Publication : ? ১৩৭৮ হেমন্ত সংখ্যা 1971-72 আষাঢ় সংখ্যা ১৩৮২
	Condition : Brittle / Good
Editor : তিমির চক্রবর্তী ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সংস্কৃত কাব্যে ভারতীয় সংবিধান

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ভি. ভি. মিরাশী ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রথম চারটি খণ্ড সংস্কৃত ভাষায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। কিছুকাল আগে তিনি নয়া-দিল্লীর সাহিত্য অকাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর অনুবাদের নাম 'ভারতস্য সংবিধানম্ পদ্যময়ম্'।

তেলুগু কবির সম্মান

তেলুগু কবি ডক্টর আরপিরালা বিশ্বম্ তাঁর ইংরেজি কবিতা 'ইউ আর মাই গুরু'র জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। ওয়াল'ড পোয়েট্রি সোসাইটি তাঁকে এই পুরস্কার দিয়েছেন।

উর্দু কবি পুরস্কৃত

উত্তর প্রদেশের উর্দু কবি ডক্টর এম. আর. খান 'মাণশা' তাঁর গবেষণা কাজের জন্যে উত্তর প্রদেশ উর্দু অ্যাকাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত ৫০০·০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থের নাম 'আয়না-এ-ইকবাল'।

মাদ্রাজে কবি-সমাবেশ

মাস-কয়েক আগে ভারতবর্ষের প্রায় ৭০ জন কবি মাদ্রাজের রাজাজী হল্-এ সমবেত হন। মালয়ালম্, তামিল, হিন্দী, মারাঠী, তেলুগু ইত্যাদি ভাষায় কবিরা কবিতা পড়েন, ও কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অনেকে ইংরেজি ভাষাতেও কবিতা পড়েছিলেন।

পুরুলিয়ায় কবি সম্মেলন

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে ও গঙ্গোত্রী পরিষদের আহ্বানে শান্তি সিংহের সম্পাদনায় গত ১৩ই অক্টোবর পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সভাগৃহে একটি কবিসভা আয়োজিত হয়েছিল। অনেক বিশিষ্ট প্রবীণ ও তরুণ কবি-সাহিত্যিক ঐ সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং উপস্থিত ছিলেন।

কবি সুশীল রায়ের সম্বর্ধনা

জীবন সরকারের সম্পাদনায় তিনজন পত্রিকা কবি সুশীল রায়ের জন্মদিনে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে এই উপলক্ষে অনেক প্রবীণ ও তরুণ কবির উপস্থিতিতে কবি সুশীল রায়ের বাসভবনে একটি মনোজ্ঞ কবিসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল।

কলকাতার বাইরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা

রণজিৎ দেব	সম্পাদিত	ত্রিবৃত্ত	কুচবিহার
জীবনময় দত্ত/রবীন দত্ত	”	সপ্তদ্বীপা	পাটনা, বিহার
ওয়াজেদ আলি	”	ধ্বনিতরঙ্গ	কাকদ্বীপ
রাধাগোবিন্দ দে	”	লিপিকা	ধনিয়াখালী, হুগলী
অশ্বিনীকুমার পাল	”	স্লেট	গোসাবা, সুন্দরবন
শ্যামা দে/উমাপাল চৌধুরী		প্রবাহ	চকবাজার, মুর্শিদাবাদ
রমানাথ ভট্টাচার্য	”	ঋতুরঙ্গ	উপ্পলিঙ, শিলং
নিখিল বসু	”	পাহাড়তলী	শিলিগুড়ি
বীথিকা প্রামাণিক/লালমোহন বিশ্বাস		বাল্মীকি	রাণীহাটি, ২৪ পরগণা
শিপ্রা মুখোপাধ্যায়	”	সপ্তপর্ণী	কুলটি, বর্ধমান
কার্তিক মোদক	”	সীমান্ত সাহিত্য	বনগ্রাম
বিপ্লব চন্দ	”	দেউটি	হাবড়া, ২৪ পরগণা
সুভাষ দেবরায়	”	আলিকালি	রসুলপুর, বর্ধমান
প্রবীর মজুমদার	”	সবুজ নক্ষত্র	রাণাঘাট
তপন প্রধান	”	শালপাতা	ঝাড়গ্রাম
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	”	এলাম	পানিহাটি, ২৪ পরগণা
পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	”	পূর্ণিমা	ভাগলপুর, বিহার
নিশীতেন্দ্র ঠাকুর	”	উন্মোচন	শিলচর
কালীকৃষ্ণ ঘোষ	”	বসুধা	মেদিনীপুর
পঙ্কজ সিংহ	”	সাগ্নিক	নূরকণা, বর্ধমান
এম. মানোয়ার হোসাইন	”	নৈবেদ্য	খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ
অমরেশরঞ্জন দাস	”	রুদ্রবীণা	লামডিং, আসাম
আনওয়ার আহমদ	”	রূপম	ঢাকা
বেবী আনওয়ার	”	কিছুধ্বনি	ঢাকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা নাম পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

●

দাম ঃ এক টাকা। বার্ষিক ঃ চার টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শরৎ সংখ্যা ১৩৮১
সপ্তদশ সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অন্যদিন

প্রবন্ধ

কবিতা ঃ পাঠক ও সমালোচক—চন্দ্রশেখর রায়
মণীশ ঘটকের কবিতা—সন্তোষকুমার অধিকারী

কবিতা

অপরাজিতা গোপ্পী * অমিত বসু * অমিয়কুমার হাটি * অশোক মণ্ডল * আজিজ চক্রবর্তী * আশীষ শিবনাথ * কঙ্কন নন্দী * কবিরুল ইসলাম * কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায় * গোকুলেশ্বর ঘোষ * গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * চিত্রভানু সরকার * জীবতোষ দাস * জীবন সরকার * তপন বন্দ্যোপাধ্যায় * তাপস ওঝা * তাপস ভবাই * তারাপদ রায় * তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় * দীপক কর * দীপেন রায় * দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় * নচিকেতা ভরদ্বাজ * নিখিল বসু * নির্মল বসাক * নির্মল হালদার * পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী * পলাশ মিত্র * পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান * পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত * প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ * প্রদীপ রায়গুপ্ত * প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় * প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত * প্রেমেন্দ্র মিত্র * বাসুদেব দেব * বিজয়া মুখোপাধ্যায় * বিনোদ বেরা * বিমল ভট্টাচার্য * বিপ্লব রুদ্র * বেণু দত্তরায় * মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় * মণিপদ্ম দত্ত * রমেন দাস * রাজকুমার মুখোপাধ্যায় * রুদ্রেন্দু সরকার * শংকর মিত্র * শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় * শান্তশীল দাশ * সুচেতা মিত্র * সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় * সুনীল হাজরা * সুশীল রায় * সুমন্ত্র সরকার * স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় * হরিপদ দে * ক্ষিতীশদেব সিকদার * শিশির ভট্টাচার্য।

বিদেশী ভাষা থেকে

ইতালী

ফ্রান্‌চেস্‌কো পেত্রার্কা
অনুবাদ ঃ মঞ্জুভাষ মিত্র

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

হিন্দী

স্বদেশ ভারতী
অনুবাদ ঃ প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ

কবি পরিচিতি

কুচবিহার—শাশ্বতী দেব

আলোচনা

জীবন সরকার

কবিতার খবর

চন্দ্রশেখর রায়

কবিতা ঃ পাঠক ও সমালোচক

এ-কথা খুবই সত্য যে, আমাদের দেশে কবিতার পাঠক চিরকালই একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কবিতা সকলের জন্যে নয়। একটি নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীই কবিতা পড়েন, তাঁর রস উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন। কবিতার পেছনে কিছু অমূল্য সময় ব্যয় করেও নিজেকে লাভবান বলে মনে করতে শেখেন। একটি কবিতা পাঠ তাঁদের কাছে শত তীর্থ পর্যটনের চেয়েও পুণ্য কাজ। কিন্তু, কবিকে ও কবিতাকে বুঝবার মতো পাঠকের সংখ্যা আরো সীমিত। এই সীমিততম পাঠকরাই হন কবিতার সমালোচক। তাঁরাই কবিতা অ-কবিতার শ্রেণী নিয়ন্ত্রিত করেন। অবশ্য, এ ক্ষেত্রেও মতবিরোধ থাকে না এমন নয়। মোহিতলাল মজুমদার ও বুদ্ধদেব বসু দু'জনই শ্রদ্ধেয় সমালোচক। কিন্তু এঁদের দু'জনের কবিতা সম্বন্ধে দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গী। করুণানিধানের মতো কবিকে হরপ্রসাদ মিত্র ত কবি বলেই মানতে চান না। কিন্তু এঁদের রায় সমাজে স্বীকৃতি পাক আর না-ই পাক, কবিতার গুণাগুণ নির্ধারণে এঁদের মতামতের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

কবিতা যে সীমিত সংখ্যক পাঠকগোষ্ঠীর জন্যেই লেখা হয়, অর্থাৎ 'কবিতা পাঠকের' জন্যেই কবিতা রচিত হয়ে থাকে,—এমন কথা যদি সহজে বলা যেত, তা'হলে কবিতা-বিষয়ক কোন সমস্যা নিয়ে নিবন্ধ রচনার প্রয়োজন হত না। এবং কবিরাও তাঁদের সীমিত স্বর্গে সুখেই কাল কাটাতে পারতেন। কিন্তু তা' হয় না, কবিরাও তা' পারেন না। বলতে গেলে আজকের কবিরা কিছুটা কঠোরও। তাঁরা 'কবিতার পাঠক' বলে চিহ্নিত সেই মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠীর দিকে চেয়েও কবিতা লিখতে বসেন না। কবিতা কবিরই ব্যক্তিগত

জিনিস—এ কথাটা খারাপ শোনালেও সার্বিকভাবে সত্য। এবং সৎ কবি চিরদিনই 'জনতার মাঝে নির্বাসন' দণ্ড মাথা পেতে নিয়েছেন—সমালোচকের সমর্থন পাওয়া স্বত্ত্বেও।

'রামায়ণ' 'মহাভারত'এর নিদর্শন তুলে লাভ নেই। কারণ, তখন গল্পের বই ছিল না। কিন্তু গল্প আদতে ছিল সমাজে। তাই সমাজের একটা বড় ভগ্নাংশ হাঁসের মতো মহাকাব্যের গল্পটুকুকে খাঁটি দুধ জ্ঞানে বেছে নিয়ে বাকী অংশকে এড়িয়ে গিয়েছেন। আমরা রামায়ণ মহাভারতের গল্প যতটা বুঝেছি, কাব্য ততটা বুঝি নি। কাব্য নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। সুতরাং সেখানেও আমরা কাব্যে আদর দেখি ভিন্ন অর্থে। এবং এই জনপ্রিয়তার মাধ্যমে বাল্মিকী বা বেদব্যাস অমর হন নি বোধহয়। তাঁদের অমরত্ব নিহিত আছে কাব্যগুণের বিচারে। এবং সে-বিচার ওই অল্প সংখ্যক মস্তিষ্কের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তবু, এখন আমাদের অতদূর পেছনে না তাকালেও খুব ক্ষতি নেই। যে-বাঁক পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিকে সহজে মেলে দেওয়া যায় সেই রবীন্দ্রনাথ থেকেই আমাদের আলোচনার একটা মীমাংসায় আসতে পারি। এবং সেখানেও আমরা একই দৃষ্টান্ত দেখতে পাব—কবিতা পাঠক সীমিত। এবং সৎ কবিতা খুব একটা আদর সমাজের কাছে পায় না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা—যা একান্তভাবেই মননধর্মী ফসল, তা তখন ততটা আদৃত হয় নি—যতটা আদৃত ছিল হেম-নবীনের দেশাত্মবোধক কবিতা। অথচ শিল্প বিচারে সে যুগে স্বদেশ চিন্তার চিহ্ন নিয়ে যত কাব্য ও সংগীত রচিত হয়েছে, তার মধ্যে যতটা শিল্প ছিল, তার অনেক বেশী শিল্পগুণসম্পন্ন কবিতা ছিল বিহারীলালের। কিন্তু বিহারীলাল রসিক পাঠকের অন্দর থেকে বাইরের ঘরে হয়ত খুব সংকোচে পদচারণা করেছেন—জনতার মাঝে স্থান করে নিতে পারেন নি। কবিতা পাঠকের এই অনীহা থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতা বাদ যায়নি। তবু এই অনীহার গৌরব বুকে নিয়েই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন নিজের মতো করে। তাঁর কবিতা আদৃত হওয়ার জন্যে তিনি সেই কালের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন নি—যতটা লক্ষ্য ছিল যোগ্য সমালোচকের দিকে। এবং পরবর্তী যুগে লোকেন পালিত ও প্রিয়নাথ সেনের মতো যোদ্ধা না পেতেন, রবীন্দ্রনাথকে আরো কতকাল যে অপেক্ষা করতে হত সমাদরের জন্যে, যা সত্য করে বলা শক্ত।

পরাধীনতার দুর্ভাগ্যের মধ্যে স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ পায়। এবং, এই চেতনায় কবি-মানস আবেগে মুখর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রভাব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন নি। পারা সম্ভবও ছিল না। তাঁর বাড়িতে স্বদেশ চিন্তার যে-চর্চা শুরু হয়েছিল, বালক রবীন্দ্রনাথকে তা' স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর এই পর্যায়ের কবিতা ও গানগুলোর মধ্যে দেশমাতৃকাকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রবণতা যতটা ছিল, ঠিক ততখানি চেষ্টা ছিল না জনপ্রিয়তা অর্জন করার। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ যদি এ-কাজে হাত না দিতেন, তাতে খুব একটা ক্ষতি হত না—সে'কাজে একান্তভাবে সমর্পিত প্রতিভা ত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু কবি-মনের তাগিদ এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নীরব থাকতে দেয় নি। এবং পরে, রবীন্দ্রনাথ নিজ নামে চিহ্নিত করে, যে-কালগুলোকে গেঁথে নিলেন, তাতে কবিতা নিয়ে যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তা' সে যুগের কবিতা-পাঠক যে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি—এ খবর তাঁদের জানা আছে, যাঁরা বাঙলা কবিতার মোটামুটি একটা ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতো কবি যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে অশ্লীল ও দুর্বোধ্য বলে অভিযুক্ত করেন এবং প্রমথ চৌধুরীর মতো লেখক রবীন্দ্র-কবিতার স্বপক্ষে ওকালতি করতে নামেন, তখন এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আপৎকালে পাঠকগোষ্ঠীর রুচির দিকে বড় একটা তাকান নি।

রবীন্দ্র-ছায়াতলে থেকে যাঁরা কাব্য সাধনা করেছেন, এবং তিরিশের দশক অতিক্রম করেও যাঁরা সৃষ্টিমুখর ছিলেন, তাঁদের ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডির মধ্যে কাব্য-জীবনের ছেদ পড়েছে। এমন কি এই দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে স্বয়ং নজরুলও নিস্তার পান নি। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে অস্বীকার করার বিদ্রোহী মনোভাব ও কবিতাকে ঊর্ধ্ব-মার্গ থেকে টেনে এনে (কালের প্রয়োজনে) মধ্যবিত্ত জীবনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাবার বৈপ্লবিক প্রবণতা যখন জেগে উঠেছে কল্লোল কালিকলম ও প্রগতির মাধ্যমে, তখন এই শ্বেত স্রোতের মুখে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছেন করুণানিধান, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক। মোহিতলালের মতো সমালোচকের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও এঁরা কালের আঙিনায় প্রায় জায়গাই পেলেন না। এই উদ্বাস্তু কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন

করুণানিধান। সত্যেন্দ্রনাথ কিছুটা উৎরে গিয়েছিলেন নিচুতলার মানুষদের নিয়ে কয়েকটি কবিতা লেখার জন্যে। কিন্তু করুণানিধানের জন্যে তিরিশের দশকের কোন প্রবণতাই দেখা গেল না। নির্জনবিলাসিতা তাঁকে একজন যথার্থ কবির বৈশিষ্ট্য দান করলেও, পাঠকের কাছ থেকে বলতে গেলে তিনি কিছুই পেলেন না। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট ভাবেই নিজের চারিত্রিক বিভিন্নতায় বিশ্বাসী।

তিরিশের দশকে যে-কবিতা আন্দোলন শুরু হয়, সেখানে কবিতাকে জোর করে নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা দেখা গেলেও, সেই কাল থেকেই যে বাঙলা কবিতা বহুকালের প্রাচীন পোষাক ছেড়ে নতুন সাজে ও মননে আত্মপ্রকাশ করার যথার্থ সুযোগ পেল—এ কথা আমাদের মেনে নিতেই হবে। এবং এ-কথাও মনে রাখতে হবে, কবিতা আন্দোলনের সেই প্রাথমিক কালে কবিরা কতখানি পরিশ্রমী হওয়ার দায় ঘাড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু কবিতাকে মানুষের কাছাকাছি এনেও কবিতার পাঠক-সীমার বৃদ্ধি ঘটেনি। কবিতা লেখাও থেমে থাকে নি। বিষ্ণু দে বা বুদ্ধদেব বসু—এঁরা কেউ-ই বিপুল সংখ্যক পাঠক পান নি।

এর-পর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে মানুষ যেন ক্রমশ দূরে সরে আসতে বাধ্য হল কবিতার কাছ থেকে। এরই ফলে ষাটের দশকে শুরু হল 'কবিতা পড়' আন্দোলন। এ-আন্দোলন যে ভিত্তিহীন, কবিতাকে যে জোর করে পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে জনপ্রিয়তার সম্মান দেওয়া যায় না—পরবর্তী যুগে তারও প্রমাণ প্রায় হাতে-হাতে পাওয়া গেছে। কিন্তু এটাকে তরুণ কবি-মনে সাময়িক উচ্ছ্বাস বলে মেনে নিয়ে এ প্রমাণ আমরা নিশ্চয় পাই যে, এ-কালের কবিরাও পাঠকের মুখের দিকে চেয়ে কবিতা লেখেন নি। বরং শম্বুকের মতো আত্মস্থ হয়ে কবিতার উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল। এই উৎকর্ষতা কতখানি সফল—এ প্রশ্নে এ-কালও মুখর। কবিতাকে একেবারে গদ্য করার জন্যে এ-দিনও ত ভীষণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে পাঠকের মধ্যে। স্বয়ং অচিন্ত্যকুমারই একবার এই গদ্য কবিতার সম্বন্ধে বাঁকা মন্তব্য করেছিলেন মনে পড়ছে। অর্থাৎ কবিতার পাঠক নিজেদের মন ও কানটিকে তৈরী করার অবকাশ পান পূর্বসূরী কবিদের রচিত কবিতার মধ্যে। ফলে নবাগতদের সম্বন্ধে তাঁদের কিছু অভিযোগ থেকেই যায়। তবু, এই নবাগতদের হাতেই কবিতা নবজন্ম গ্রহণ করে।

স্বাধীনতার পর আমাদের বাঙলা কবিতা দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। নজরুল-সুকান্তর প্রভাবে একদল কবি কবিতাকে দিয়ে সমাজের কাজ করাবার স্বপ্ন দেখেন। অন্যদল জীবন-যন্ত্রণার মধ্যেই এক অতীন্দ্রিয়তার সন্ধানে রত। সমাজের বাস্তব ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রথম দলীয় কবিদের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও এসব কবিতা সুদূর ভবিষ্যতের নাগাল ছোঁয়ার প্রবণতা রাখে না। কেবল স্ব-কালের মানচিত্র কবিতায় উপস্থিত করেই তাঁরা তৃপ্তি খোঁজেন। যেহেতু কাল পালটাচ্ছে—পালটাচ্ছে সমাজ ব্যবস্থাও, সেহেতু সামাজিক সমস্যায় কবিতাকে মুখর করতে গেলে কবিতা নিতান্তই সাময়িক ফসল হয়ে ওঠে। তার মর্যাদা প্রচারপত্রের মর্যাদার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানেও সেই আগের কথায়ই সমর্থন দেখি ঃ কবিতা লেখার জন্যে কবির মেজাজই সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

দ্বিতীয় দলে যাঁদের কাব্যযাত্রা শুরু, তাঁরা সব শ্রেণীর কবিতা পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারেন না। সুকুমার শিল্পবোধ এঁদের কবিতাকে এক রমণীয় লাবণ্য দান করে। বলতে গেলে রবীন্দ্রানুসারী কবি করুণানিধান, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবি জীবনানন্দ কবিতায় যে-সৌন্দর্যের বার্তা বহন করেছেন, এ-দলের কবিরা সেই সৌন্দর্যের উপাসক। এঁরা একান্তভাবেই মনন ধর্মে বিশ্বাসী। এঁদের বক্তব্য কখনো শিল্পগুণকে ক্ষুন্ন করতে চায় না। কবিতা যেহেতু সুকুমার শিল্প বলে পরিচিত, যেহেতু এঁরা অনেকাংশে কবি হতে চাইছেন এবং স্ব-কালের ব্যথা-বেদনা ও হতাশাকে শিল্পায়িত করে স্রষ্টার ধর্ম পালনে নিয়োজিত—এমন ধারণা পোষণ করা ভুল নয়। তাই এই শ্রেণীর কবিতায় দুর্বোধ্যতা অশ্লীলতাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সে-কারণেই পাঠক এঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন, কিন্তু কবিরা কোনকালেই নিন্দুকের কথা নিয়ে বিব্রত থাকতে রাজী নন। তাঁরা সৃষ্টি-মুখর, কবিতার মন ও মননের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান। তাঁরা কেবল অপেক্ষা করেন একজন যোগ্যতম সমালোচকের।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাকে আশ্রয় করে যে-কবিতা চর্চার শুরু হয়েছিল, তার বিপক্ষে ও স্বপক্ষে তৎকালে অনেককেই সোচ্চার হতে দেখা গেছে। অনেকে এ আশঙ্কাও করেছিলেন যে, কবিতার যথার্থ মৃত্যুই বুঝি ঘনিয়ে এল। এ-ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর কৈফিয়ৎ ঃ 'ভাল কবিতা লেখার জন্য যে-রকম জীবন আমার নিজের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল বলে জানি, আমি

চাইব আমার জীবনকে সে-ভাবেই গড়তে, সেটা এক্কোপিজম নয়, সেটা শুভবুদ্ধি।' তখন কবিতার প্রচলিত imago-এর রূপান্তর ঘটছে দ্রুত। তার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে অভ্যস্ত পাঠককুলের পক্ষে সহজ ছিল না। জীবনানন্দ কবিতায় যে নতুন ঢঙের symbol প্রয়োগ করলেন, তাও সকলের কাছে সহজ মনে হয় নি। ('তোমার কান্নার সরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।') সমর সেন করে তুললেন কবিতাকে একেবারে গদ্যের কাছাকাছি। সে-সময় এই রূপান্তর দেখে যাঁরা 'হায় হায়' করেছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের অনেককেই আবার এই পরিবর্তনের কাছে নতজানু হতে দেখা গেছে।

এমন একটা 'হায় হায়' রব উঠেছিল 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের সম্বন্ধেও। অনেকে প্রথম যৌবনের এক সাময়িক উন্মাদনাও মনে করেছিলেন 'কৃত্তিবাস'কে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কি রকমভাবে বেঁচে আছি' পড়ে এক অগ্রজ কবিকে মন্তব্য করতে শুনেছি ঃ 'এগুলোকে কবিতা বলা চলে না'। কিন্তু সময় ওই 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের এক কথায় দূরে ঠেলতে পারলো কই ?

আসলে কবিতাকে নতুন সাজে সাজাবার এই চেষ্টা কবিদের নিজস্ব খেয়ালের ওপর নির্ভর করে। অমিতাভ দাশগুপ্ত স্পষ্ট করেই ত বলেছেন ঃ 'আমি কবিতা আর প্যামফ্লেটকে এক জায়গায় বসাতে নারাজ। কারণ আমি এই সূর্যের নিচে সব কিছুকে নিয়েই লিখতে পারি, যদি তা কবিতা হয়ে ওঠে'। ('একটি প্রয়োজনীয় থাপ্পড়' ঃ কবিতাপত্র—জ্যৈষ্ঠ—১৩৮১) এ-খেয়ালকে আধুনিক পাঠক যে মেনে নিতে পারবেন এমন আশা সব সময় করা যায় না। কারণ, কবিরা যতটা দূরদর্শী হতে পারেন, পাঠককুল ততটাই অদূরদর্শী তার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে ভালবাসেন। তাই আধুনিকতাকে তাঁরা রসাতলে যাওয়ার সূচনা মনে করে অতি সহজেই 'হায় হায়' করে উঠতে পারেন। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে দীপ্তি ত্রিপাঠী একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন ঃ 'ভাগীরথী গঙ্গার মতো তার স্রোতে জীবনধারার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতা হয়তো নেই—পারিপার্শ্বিক যন্ত্র সভ্যতার অনেক ময়লা এসে তাকে ঘোলাটে করেছে, কিন্তু তারও প্রার্থনা সমুদ্রসংগম।' কবিতাকে অ-কবিতা করা কবির বাসনা নয়।

বস্তুত, এখন কবিতা বোঝার জন্যে শুধু কানের সাহায্য নিলেই প্রয়োজন

শেষ হয়ে যায়না, এমন কি কবিতা পাঠের জন্যে কেবল এক জোড়া চোখই কাজ করে না, সেই সঙ্গে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সাহায্যও প্রয়োজন হয়ে ওঠে। আজ আমাদের দেশে ক'টা পাঠক এতখানি পরিশ্রমী হতে পারেন ? সুতরাং কবিতা যত মননধর্মী হয়ে উঠছে, ততই পাঠককুল সরে যেতে চাইছেন কবিতার পরিধি থেকে। আমাদের দেশে এখন কবিতা রচয়িতা যত আছেন, পাঠকের সংখ্যা তার চেয়ে অধিক নয়। তবুও আশ্চর্য এই যে, কবিতা লেখা থেমে নেই। বিরাম নেই নতুন কবির আবির্ভাবের। অর্থাৎ পাঠকের কল্যাণে কবি জন্মায় না, সৎ কবিই বরং পাঠক তৈরীর ক্ষমতা রাখেন। এবং সমালোচকেরও। এবং কবিদের যদি কোন মোহ থেকে থাকে, তবে ওই শেষোক্ত গোষ্ঠীর প্রতিই আছে।

সন্তোষকুমার অধিকারী

মণীশ ঘটকের কবিতা

নদী মাত্রেরই একটি সাধারণ অভিমুখ থাকে ; সে অভিমুখ হল সমুদ্র। তেমনই কবি মাত্রেরই থাকে একটি সাধারণ আকাঙ্ক্ষা—যা অবশ্যম্ভাবী এবং যার উদ্দেশ্য কাব্যরসের সৃষ্টি। রস কাকে বলে এ নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে, কিন্তু সমস্ত বিতর্ক এড়িয়ে বলা চলে, রস অর্থে বুঝি নন্দন। অর্থাৎ যা অন্যের জন্য আনন্দ সৃষ্টি করে।

আরেকটু গুছিয়ে বলা যায়, কাব্য যতই আধুনিকই হোক, তার ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, প্রকরণ ইত্যাদিকে যতই নতুন করে সৃষ্টি করা যাক, তবু কবিতাকে কোনদিন রসহীন বা তৃতীয় পাঠকের কাছে আনন্দশূন্য করে পরিবেশন করা যাবে না।

তাই কল্লোলযুগের বাংলা কাব্যে ও সাহিত্যে যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল অতীত ঐতিহ্যকে ভেঙে বস্তুবাদী বিজ্ঞানের অভিমুখে রওনা হওয়ার কথা, যখন কাব্যে রোম্যান্টিক চিন্তা ও ভাষাকে পরিহার করে কঠোর নৈরাশ্যবাদী জীবনবাস্তবের মধ্যে কবিতার উপাদান খোঁজার চেষ্টা, যখন কবি বলেন ঃ

'এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে'

তখনও কিন্তু তাঁরা কবিতাই লিখেছেন, এবং সেই কবিতায় শুধু নিজেকে নয়, অন্য পাঠককে নন্দিত করাই ছিল তাঁর কামনা। বাস্তবমুখী হওয়ার ব্যাকুল প্রয়াসে কোন এক কবি লিখেছেন ঃ

'চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য,
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।'

তবুও বাস্তবজীবন, যে জীবন মাটি ও কাদার মধ্যে মাখামাখি হয়েও তার উন্মত্ত জীবন-প্রবাহে ছড়িয়ে থাকে, সে জীবনের পরিচয় কোথাও পাইনি।

রাশিয়ার সাহিত্যে জীবন বাস্তবতাকে যদি গ্রহণযোগ্য করে থাকেন গোর্কি, তবে সে শুধু তাঁর অপরিমেয় বেদনাবোধ, জীবন জিজ্ঞাসা এবং পরিমিত জ্ঞানের জন্যে। গোর্কির হৃদয়ে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে যেমন তাঁর জীবনবোধের গভীরতার সমন্বয় ঘটেছিল ; বাংলা সাহিত্যে মণীশ ঘটকের মানসিকতায় গোর্কির প্রভাব প্রত্যক্ষ।

কবি মণীশ ঘটকের পূর্বসূরী 'পটল ডাঙার পাঁচালী'র স্রষ্টা যুবনাশ্ব। তাই যুবনাশ্বর মানসিকতা এবং অভিজ্ঞা যে কবি মণীশ ঘটকের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, সে কথা বলার দরকার আছে।

কল্লোল যুগের কবিদের সম্বন্ধে একটি সাধারণ কথা বলা যায় যে, তাঁদের মধ্যে বাস্তববাদী হওয়ার প্রবল আকাংক্ষা ছিল। যে আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় একজন কবি লিখলেন ঃ

'আমি কবি যত কামারের আর
কাঁসারির আর ছুতোরের…'

এই বাস্তববাদী হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা জীবনকে এক নতুন অভিধায় গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন তার দারিদ্র্য, দুঃখ, যন্ত্রণার সঙ্গে তার নগ্নতার স্বরূপকেও। শুদ্ধ আদর্শকে অনুসরণ করাই তাঁদের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। জীবনের এক দ্বিধাহীন বোহেমিয়ান উচ্ছৃংখলতাই তাঁদের কাম্য বলে মনে হয়েছে।

এই কল্লোলযুগেরই কবি মণীশ ঘটক। যিনি নজরুল, যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের উত্তরপর্বে এবং সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব-অধ্যায়ে বাংলা কাব্যে রিয়ালিজমের ধারাকে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন।

১৩৪৬-এর (ইংরাজী ১৯৪০ সালে) মাঝামাঝি সময়ে বার হয়েছিল তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'শিলালিপি'। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা—'পরমা'। সেদিন বাংলা কবিতার বিভিন্ন সংকলনে 'শিলালিপি' থেকে কবিতা সংকলিত হয়েছিল। 'শিলালিপি' আজ লুপ্ত। কবির কাছেও এর একটি কপি ধরা নেই। তবু এর অনেকগুলি কবিতা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

'পরমা' কবিতার মধ্যে কবির ঐতিহ্যবাহী মনের পরিচয় ধরা পড়ে। একই সময়ে যখন তিনি লিখেছেন ঃ

'ভাঙাও ঘুম ভাঙাও
কুহক কাহিল মৃত্যু থেকে সেই জানোয়ারদের
বেয়াল্লিশ হাজার জানোয়ারদের।

জবলুক তাদের চোখে
তাজা ইস্পাতের নীল ঝলক,
শিউরে উঠুক বর্বর অত্যাচার।'

[দোস্ত, তাদের জাগাও]

তিনিই লিখলেন 'পরমা' কবিতায় ঃ

'পূর্ণলোহু যৌবনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সেদিন জবলিতেছিল এ দেহ অম্বরে।

দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিল অগ্নিবর্ষী শ্বাস।
চক্ষে ভরি ত্রাস
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধবংস উৎসবে!
যৌবন গৌরবে
বল্কল শাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হ'ল শুভ্র বক্ষময়।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গ তীর মুহুর্মুহু থমকিল হায়।'

পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ 'যদিও সন্ধ্যা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। অর্থাৎ দীর্ঘ আঠাশ বছর পরে এবং তার পরের গ্রন্থ 'বিদুষী বাক' বেরিয়েছে ১৯৭০ সালে। ১৯৭৪ সালে পাবলো নেরুদা থেকে অনুবাদ করা কবিতাগুলির একটি সংকলনও ছাপা হয়েছে।

মণীশ ঘটক অতি আধুনিক ও বাস্তববাদী হয়েও কবিতার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত নন—এ ঘটনা বাঙালী পাঠকের কাছে অনুভবের বিষয়। যিনি সমকালীন বিশ্বের সাম্যবাদী সাহিত্যের মর্ম উদ্‌ঘাটন করে তার সাহিত্যাদর্শ গ্রহণ করেছেন, তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির অন্তর্যন্ত্রণাকে কোনদিনই ভুলতে পারেন নি। তাই পুরোপুরি বাঙালী কবিরূপেই তাঁর বিকাশ। বিদেশী অনুকরণ এবং বিদেশী শাসন—এই দুইই ছিল তাঁর ঘৃণার বস্তু। বিদেশের মেকি অনুকরণ যে কখনও জাতির সম্পদ বৃদ্ধি করে না ময়ূরপুচ্ছ দাঁড়কাকের মতই তার দৈন্যকে পরিস্ফুট করে তোলে, একথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে তিনি দ্বিধান্বিত হন নি।

'বাঙালীর ছেলে রাশিয়ান সার্ট পরে,
বড় বহরের ভাটিয়া ধুতিতে পায়জামা প্যাঁচ কসে,
বাটার দোকানে কিনিয়া সস্তা দরে
গ্রীক স্যাণ্ডাল চরণে চড়ায় আঁট করে' বক্‌লসে।'
....
....

ওদিকে আন্দামানে
সিন্ধুর নীরে সন্ধ্যা ঘনায় দগ্ধ দিনাবসানে।'

বুকের মধ্যে যা ব্যঙ্গ হয়ে ফুটে উঠছিল, তা শেষ পর্যন্ত রক্তের অক্ষরে প্রকাশ পেল।

প্রথম জীবনের উগ্রতা তাঁর শেষ জীবনে এক শান্ত জিজ্ঞাসা বহন করে ফিরে এল। 'বিদুষীবাক' গ্রন্থে তিনি প্রাচীন 'হিন্দু পুরাণ'-এর যুগে ফিরে গিয়েছেন। গ্রন্থের সংবেদনগুলি দেবী চণ্ডির উদ্দেশ্যে রচিত—কোথাও প্রার্থনা, কোথাও প্রশস্তি। বহুবিচিত্র অনুভূতির মধ্যে থেকে নিজেকে কুড়িয়ে এনে একক চিন্তার গভীরে কবি সমাহিত। তিনি প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহানিয়মের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে বিমুগ্ধ।

'স্পন্দনময়ী বসুধা লভিছে শক্তি
রূপে রসে গানে মনোলোভা অভিব্যক্তি
পরমা প্রকৃতি ত্রিবিধ গুণের সাম্য
ইন্দ্রিয়াতীত পরাবাক্ তার কাম্য॥'

এক ধ্রুপদী সত্যের অনুভবে কবির হৃদয় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতঃ এক যুগের হিন্দুধর্মে (পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মে) প্রার্থনার ওপরে যে জোর দেওয়া হয়েছিল, মণীশ ঘটক সেই পথ ধরেই এগিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "বর্তমান চৌত্রিশটি সংবেদন চণ্ডী-ভিত্তিক, বা অনুকরণ নয়, অনুভূতিজাত শ্লোকসমষ্টি।" কিন্তু সংবেদনগুলি যখন পড়ি ঃ

'আমিই সচ্চিদানন্দ আমি দেহাতীত
একাদশ রুদ্ররূপে হই কালান্তক
অষ্টবসু হয়ে করি সাধাকে অন্বিত।'

অথবা,

'পরা প্রকৃতির দেবী সত্বগুণবতী
হৃদারূঢ়া জ্ঞানময়ী মহা সরস্বতী…'

তখন মনে হয় অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি প্রার্থনার পথ এড়িয়ে পৌরুষের প্রত্যয়ে পৌঁছোতে।

তবু, মণীশ ঘটক ফিরে এসেছেন হিন্দুত্বের চিরন্তন বোধে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—এই সংবেদনগুলি তাঁর 'অনুভূতিজাত'। অচিন্ত্য-কুমার, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং বুদ্ধদেব বসুর মতই তাঁর চেতনা ঐতিহ্য চিন্তায় ফিরে এসেছে। ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত পরভৃত হয়ে বাঁচা তাঁর কাছে আকাঙ্ক্ষণীয় নয়।

একদা উত্তপ্ত জীবনবোধের ধারায় তাঁর কাব্য উদ্বেল হয়েছিল। সাজানো কৃত্রিম পথ ছেড়ে আবেগের সহজ স্রোতস্বতীতে তিনি গাহন করেছিলেন। আজ, জীবন-সীমায় এসে তিনি স্থির ও ধ্যানগভীর; জীবনসন্ধানী পুরুষ॥

কবিরুল ইসলাম

দোষ ছিলো

দোষ ছিলো সবটা আমার। আমি তাকে
কথার ভিতরে ডেকে আলাপে বিস্তারে
কথার ভিতরে কথা ছিলো
অনেক হয়েছে শোয়া বিছানা বালিশে
আমি তাকে বলিনি ঘুমোও।

আমি চালচুলোহীন পকেটে হাতড়ে
খুঁজিনি আধুলি
আজকাল ঘরভাড়া সহজে মেলে না
ঘরে দুরে এমনই আকাল।
তবু কে পারে বাইরের টানে চার দেয়ালের
দুদণ্ডের হাতছানি এড়াতে?

দোষ ছিলো সবটা আমারই। আমি তাকে
গল্পের অন্দরে ডেকে
বলিনি ঃ এই নাও চাবির গোছা

এই তো সময়॥

নির্মল বসাক

মুখ তো শুধু মুখই খোঁজে

নাগচম্পা বনের ভিতর পথটা কেন বেঁকে গিয়েছে
পাড়ের কাছে কেন বা নদী বায়না ধরছে উথাল পাথাল
যুবতীমন পাক খাচ্ছে—টানা পোড়েন শিল্প সভা
বাজিমাতের অধিকারী—মাকুর মারে দগদগে ঘা
শালুক সায়র মধ্যিখানে ঃ মুখ তো শুধু মুখই খোঁজে
ধুলোয় মাখা টলটলে জল ডাকছে ধূসর কুয়াশারে।

কঙ্কন নন্দী

প্রিয়তমাসু

শুধু দূরে যাও তুমি
উত্তরে পাহাড়শ্রেণী দক্ষিণে সাগর জল
অগ্রপশ্চাৎ ভেবে দূরে যাও তুমি
পাহাড়ের কাছে যাও ? সাগরের কাছে ?
বড়ো বেশী দুঃসময় বড়ো বেশী দুঃসময়
চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছে সবকিছু
উত্তুরে পাহাড়শ্রেণী দক্ষিণে সাগর দেখা
বন্ধি পাচ্ছে বন্ধি পাচ্ছে দিনদিন
আমি সব ছেড়ে আমার মধ্যেই বসে থাকি

শুধু তুমি দূরে চলে যাও

দীপেন রায়

উত্তরাধিকার

তুমি গ্রামে আমি শহরে
স্বপ্নের একটি মুখ
আধাআধি
এভাবে দু'জনে
একই পূর্ণতা।
অপূর্ণ যা
ভালোবাসা এবং বৃষ্টির।
আমাদের হৃদয়ে
এবং আবেগে
সটান মশাল এক আগুন
প্রতিদিন
গ্রামে ও শহরে।

তুমি গ্রামে আমি শহরে
প্রতিদিন একটি সংবাদ
একই খবরে
গানে
কবিতায়
নির্দিষ্ট
এবং
সমুদ্রে
একই জলের
ঢেউয়ের ভিন্নতা
সমতলে
বৃক্ষের অনাবিল স্বাধীনতা
মাটি ও রৌদ্রের
উভয়েরই উত্তরাধিকারী।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ওরা এবং আমি

ওরা কেন অমনভাবে তাকায়
ঘৃণা করে ? ঈর্ষা করে নাকি ?
বুঝি বুকেই বসিয়ে দেবে ছুরি
হঠাৎ পেলে ফাঁকায় !

নাকি আমিই জ্বরের ঘোরে শুধু
ভুল দেখছি, ভুল করছি, ভুলে
ছিঁড়ে আনছি টাল-মাটাল শিকড়—
উঠোন জুড়ে, মরুভূমির ধূ ধূ ?

ভুল বা ঠিক পড়ছি একই তাপে
এবং তার কারণ, শুধু ওরা,
আয়না জুড়ে অনেক ছায়া দোলে—
আয়না নয় আমার মাপে-মাপে ॥

বুদ্ধদেব সরকার

ছন্দ পতন

না, অমনি করে দাঁতে নখ খুঁটো না
না, অমনি করে দাঁতের অসুখ ডেকো না
সময় চিবিয়ে খাচ্ছো খাও
বয়স ভাঙিয়ে খাচ্ছো খাও
অবুঝ মনের ভালোবাসা ঠুকরিয়ে খেও না।

গতস্য শোচনা নাস্তি
তোমার অবুঝ মনের পাগলামোটা ঠিক বুঝিনি
তাই এখন কবিতা নয় শুধু খিস্তি
শাপান্ত-বাপান্ত করে খিস্তি দিচ্ছে রোজ
সকাল থেকে দুপুর
দুপুর থেকে রাত
ভালবাসার হৃদয়টাকে টুকরোকরছে
শাঁখের করাত।

এই সেদিনও তুমি ছিলে
চোখের মণি
বুকের টি বি
আরও কতো কি···

গতস্য শোচনা নাস্তি—
না অমনি করে দাঁতে নখ খুঁটো না
না অমনি করে দাঁতের অসুখ ডেকো না।

ভুলে যাচ্ছি তোমার মত আমিও
এখন চোখের কোণে এইচ-টু-ও।

সুশীল রায়

তুফান

তুফান আসবেই তাই দরোজা জানালা খুলে
রেখেছি দরাজ !
সজোরে দেওয়ালে ধাক্কা দিতে দেব কেন,
তাইতে কবাট
অবারিত রেখে প্রতীক্ষায় আছি ঝড়-তুফানের।
এলোমেলো এলোচুল ধীরে ধীরে গুচ্ছে গুচ্ছে হল,
কে-যেন নিশ্বাস ফেলল. মনে হল যেন হা-হুতাশে
কে-যেন আফশোষ করছে ! এর নাম ঝড়
মাথার উপরে দেখছি খোঁপার বহর !
সে-খোঁপা বেষ্টন করে সোনার লতার মত হার
ঝিকমিক করে ওঠে ; চকমকি পাথরে আগুন
চমকে ওঠার মত চমকে দেয় ঝলসায় চোখ
বুকের ভিতরে শব্দ শুনি ঘোরতর।
তুফান আসবেই যদি আসুক—আসুক !

বিনোদ বেরা

অর্ফিয়ুসের প্রতি

তুমি সেই অনরোনীয়ান
উদাত্ত মাধুর্য, অর্ফিয়ুস
হৃদয় পাগল করা গান
গাও, জাগি আমরা মানুষ।

তুমি দাও যে উপঢৌকন
স্বর্গে মর্তে তুল্য নেই তার
অমল অনন্ত উপার্জন
দৃপ্ত সুর সংগীত ঝংকার।

বক্ষে জ্বলে বাসনার রাশি
অত্যুজ্জ্বল মণিখণ্ড সম
স্তব্ধ হয়ে আছে প্রাণ বাঁশী
জাগাও ব্যথায় প্রিয়তম।

বক্ষ শিলা দ্রবীভূত করা
অফি'য়ুস, তোমার সংগীত
বাজে যদি তবে ম্লান মরা
প্রাণ হতে ঝরে যাবে শীত ॥

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরা

ফিরে আসছি বললে ভুল হবে
তবু আর একবার ফিরে আসতে চাই
আমার কাছে নতুন কোন স্মৃতি নেই
লোভ হয় একদিন মন্দির চাতাল ছুঁয়ে
নতজানু আমি ক্ষমা ভিক্ষা করি
এসব ছবিও অসম্পূর্ণ
ক্রমশ একক শব্দের ভিতর পাল্টে যেতে থাকি
ঘরে বাইরে দ্রুত বদলে যায় নিঃশব্দ রণন
তবু ফেরা একক ফেরা
বাইরে মঙ্গলঘট ডাবকুশী আমশাখা
উঠোনের চাতালজুড়ে পিটুলি আলপনা
দূর্বা ও ধানের শিষ তাম্রপাত্রে
বিজনে এই ফেরার সময় আমার স্মৃতির স্মরণ

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা চারজন

আমরা চারজন তখন বসে তাস খেলছিলাম।
ব্ল্যাক আউটে ঢিমে আলোয় প্রেতপুরীর মতো শহরের চেহারা।
সাইরেন বাজতেই খেলা বন্ধ করে

সিঁড়ির তলায় আশ্রয় নিলাম।
রাত দশটা। শীতের রাত কুয়াশায় ঢাকা।

আমরা চারজন।
দুজন যুবক। দুজন যুবতী
শীতে আতঙ্কে জড়াজড়ি করে
একটা গাছ হয়ে গেলাম।
বোমার শব্দে জানালার শার্সি বাজে,
দেয়াল কাঁপে।
কতক্ষণ পরে যে 'অল ক্লিয়ার' ধ্বনি শুনলাম,
তা কি কারও খেয়াল আছে?

শীতে ভয়ে আতঙ্কে রোমাঞ্চে উত্তেজনায়
এক পেয়ালা গরম কফির বড় প্রয়োজন।
তাই আমরা নিকটস্থ কাফেতে ঢুকলাম।
আমরা চারজন।

দুজন যুবক। দুজন যুবতী।
এখনও যেন একটা গাছই রয়ে গেছি।

অমিত বসু

ভালবাসা পনেরো মিনিট

রিক্সাওয়ালা ডেকে বললে ঃ
এবার একটু মিনিট পনেরো ভালো ক'রে দেখে লিন
তাড়াতাড়ি যাইতে অইব মুড়িগুলান ভিজাই নিছি

পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট
ভালবাসা পনেরো মিনিট তোমায় দিলুম
পাথরে খোদাই ক'রে কোনো এক একনিষ্ঠ লিখে গেছে ঃ
বারিদবরণ—পুটলিটোলা
অনামিকা আমি তোমায় ভালবাসি।

বাসুদেব দেব

আরশোলা

আরশোলা উড়ে যায় ঘুমের ভিতর স্বপ্নে অন্তগূঢ় নিম অন্ধকারে
বাদামি ডানার গায়ে পচে ওঠা উচ্ছিষ্টের অন্তিম আঘ্রাণ
বাংলার চোখের জল কফিঘর থেকে আরো দূরে
সকালবেলার প্রথমে কাগজে থাকে অক্ষরের কাঁটাতারে ঘেরা
সুরক্ষিত গণতন্ত্র গোলাপের হাসি

আরশোলা উড়ে যায় পালংকের নিচে ভাঙে শান্তির কৌমার্য
এখানে সৃষ্টির যন্ত্র নপুংসক অথবা নিয়তি
নিয়ন্ত্রণ করে আর উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়, এবার শরতে
ঘাসের ওপর আমরা শিশিরে মিশিয়ে দেব পদ্যের আতর

বাংলাদেশ তুলে নেয় দীর্ঘ শীর্ণ হাতে ফলিডল
রাজভবনের থেকে দূরে, বর্ণ থেকে বর্ণান্তরে
অক্ষরমালার পিছে কালিঝুলি মেখে
আরশোলা উড়ে যায় ঘুমের ভিতর স্বপ্নে অন্তগূঢ়
নিম অন্ধকারে

রমেন দাস

গুচ্ছে সাজাবো না

ফুলকে বেঁধো না গুচ্ছে
আমার নিত্য ঘর আমি আর ফুলে সাজাবো না।
ভ্রমর উন্মনা হোক, চৈত্রবিলাসী—আহা,
মাধবী বল্লরী দিশেহারা—
আকাশ নায়িকা হোক
পলাশের পত্রলেখা বক্ষে দিক নব শিহরণ।
উড়ন্ত পাখির দিকে চোখ রেখে,
আমি আর পথ হারাবো না!

তার চেয়ে এই ভালো, মৃত্তিকার হরিচন্দন,—
দূর্বাধান্যে আশীর্বাদ, একটি সন্তান-সুখী নারী;
নদীর উধাও স্রোতে বাঁধা ঘাটে ডুব দিয়ে স্নান,
আমার মনের বন্ধে এই ছবি ফুল হোক—
আমি তাকে গুচ্ছে সাজাবো না!

বেণু দত্তরায়

ভয় ভাঙলে একদিন

ভয় ভাঙলে একদিন তুমি ডাকবেই
ঠিক-ঠিক ডেকে উঠবেই
আজ তুমি নিজেকে আড়াল করছ
পর্দা দিয়ে, শাসনের দীর্ঘ আড়াল
চুপিচুপি নিজেকে নিয়ে
তোমার যন্ত্রণার আর অন্ত নেই
সাত-সতেরো নালিশের আর অন্ত নেই
একদিন ডাকবেই তুমি আমাকে
ডাকবেই

কে কবে আবার কার ভয়
ভাঙিয়েছে কোথায়
কে কবে আবার কার দীর্ঘ চোখ
চুরি করতে পেরেছে, একদিন
নিজেরই হাত থেকে লুণ্ঠন করে
ছুঁড়ে দেয় দুর্গ-দালানের বাইরে
নিজেকেই
খুন করে বেরিয়ে আসে
নিজেরই মধ্যে
ভয় ভাঙলে একদিন তুমি ডাকবেই
ঠিক-ঠিক ডেকে উঠবেই

তাপস ওঝা

আমার আত্মজ শব্দ এবং আমি

হঠাৎ হঠাৎ রাত্রিবেলা শব্দ শুনি
শব্দরা সব তোমার থেকেও অনেক কাছের
আমার ভাই-এর চোখের চেয়েও করুণ তারা
'তাপস, তুমি নিজের কাছে হারছ কেন ?'

সেই যে আমি তোমার কাছে চশমা নিয়ে
আমার চোখ ক্ষণিক তরে লাল করেছি
অমনি তারা ভীষণ ভয়ে চুপ করে যায়
আমি ভাবি, হারাছি কোথায় ?
জেতার জন্য আমিই আছি।

তারাপদ রায়

ছুটির দিনের সকাল

একই ভাবে লম্বা চুরুটে ধোঁয়ায় সুগন্ধে
মিলেমিশে বায়বীয় হয়ে যায়
ছুটির দিনের সকাল।
কলহাস্যে আমাদের ঘর ভরে ওঠে,
যেন কোথাও কোনো দুঃখ বা শোক ছিলো না,
কোনোদিন ছিলো না।

যে কোনো গন্ধের একটা পরিবেশ আছে,
আছে এক ধরণের নির্দিষ্ট স্মৃতি,
নীল রঙের লতানো ধোঁয়ায়
আমাদের ঘর ভরে ওঠে,
আমাদের কলহাস্যময়
দুঃখ ও শোকহীন ছুটির দিনের সকাল।

চিরন্তন

সেলোফেনে মুড়ে রাখলে
হিমাঙ্কের নিচে
হৃদয়ের কোনো স্মৃতি জারিত হয় না।
অ্যালবামে সযত্নে রাখা
অতীতের মুখ
চিরদিন নির্ভাজ মসৃণ।

জানি সব
তবু হায় আমি নিষ্ঠাহীন
সময়ের স্রোত রুখতে
কোনোদিন একটা কড়ে আঙুলও নাড়ি না।

পুরানো ছবির তাড়া
খুঁজতে গিয়ে তাই
দেখি শুধু কীটে কাটা
জঞ্জালের পুঁজি।

জীবন কখন খাত
বদলে বয়ে গেছে
প্রত্নশিলা রাখলেও খোদিত
সেখানে হারানো কোনো ক্ষণ
অপেক্ষায় নেই কম্পমান।

যে মিছিল অফুরন্ত আদি অন্তহীন
তাতেই বিলীন সব পল ও বিপল।

যে মুহূর্ত চমকায়
প্রত্যেকটি বুকের স্পন্দনে
তাই সময়ের সত্য।
তারই মাঝে দ্রবীভূত জীবন্ত উত্তাপে
একাকার অনাগত অধুনা অতীত।

চিরন্তন তাই জানি,
চির ধাবমান
অনিত্য অস্থির।
বিধাতা বহতা।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

স্মৃতির দুঃশাসন

স্মৃতির দুঃশাসন আমার সেন্টিমেন্টের বর্ম
দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো পাকে পাকে খোলে
শব্দের বাটালি কুঁদে খায় প্রেমের কৌমার্য
আজ যেখানে ঘর, কাল সেখানে ফুলও
ঝুল বারান্দা ছিলো।

টাঙানো দোলনাটা ভীষণ দুলতে দুলতে
একবার আকাশ একবার মাটি একবার আকাশ
হঠাৎ গতি হারিয়ে ভীষণ নিবিড় হয়ে
তোমাকে চুমো খাচ্ছে—
সমস্ত গোলাপ ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা
ঘুরতে ঘুরতে হুড়ু হয়ে গেল
সেই নগ্ন রাশি রাশি জলস্তূপ ফুলে গর্জে
ছুটে গেল চোদ্দটা রঙের স্মৃতিবর্ণ
আদ্ধেক দুঃখ খানিকটা না বোঝা আনন্দ
বুকের মধ্যে ভয়, শরীর ঝাঁকানো শিউরে ওঠা
আছড়ে পড়া হাসির টুকরো কাঁচ
লুকিয়ে কান্নার দমক, লজ্জা পাওয়ার লজ্জা
তোমার পুষ্ট বুক ছুঁতে গিয়ে কেঁপে যাওয়া হাতের আঙুল!

স্মৃতির দুঃশাসন আজ পথে পথে
আমার সেন্টিমেন্টকে লাঞ্ছিত অপমান করে
জ্বালায় আর অশ্রুতে,
কি সাহস তার!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সিংহাসনে ঘুণ পোকা

সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে
কেউ তা শোনে নি
সকলেই ভেবে বসে আছে যেন
রাজ্যপাট আছে ঠিকঠাক
আকাশ রয়েছে ঠিক আকাশেরই মতো
রোদ জল ঝড় নিয়ে সময়ের এত হুড়োহুড়ি
সবই আগেকার মত, যেমন মানুষ
অকারণে মরে যায়, আবার জন্মায়
এই যে নিশ্চিন্ত সুখ, প্রগাঢ় প্রশান্তি, এর
অলক্ষ্যে আড়ালে
সিংহাসনে ঘুণ পোকা শব্দ করে ছির ছির ছির…

পলাশ মিত্র

কেন শুধু

কেন শুধু এইভাবে বেঁচে থাকা
এইভাবে জীবনের দাঁড় টেনে টেনে
এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত ছুঁয়ে
বার বার ঘুরে ফিরে আসা?
বার বার ক্লান্ত হওয়া
কপালের ঘাম মুছে
অস্থির হৃদপিণ্ড নিয়ে
বার বার বাঁচা-বাঁচা খেলা ঃ
ভেড়ার পালের মতো
কোনও দিন পড়ন্ত বেলায়
ধীর স্থির সোজা পথে চলা।
কেন এই শিরায় শিরায়
পিতার দূষিত রক্ত

অনিয়ম অনাচার
কেন এই পাপ ?

কেন শুধু এইভাবে বাঁচা
বার বার বাঁচা-বাঁচা খেলা ?

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন নিয়ে

নীলকণ্ঠ পাখীর খোঁজে
অনেকেই অহল্যা হয়েছে
তবুও খোঁজার নেই শেষ
অত্যাচারে কত গ্রাম 'মাইলাই' হ'ল
কত স্বপ্ন ঝরেছে অকালে
তবুও মেকং-এ জাগে নতুন সূর্য
নতুন শপথ নেয় নবজাত শিশু
মায়ের স্তনাগ্র মুখে নিয়ে ঃ

এখানে জীবন শ্বাপদসংকুল আজ
মানুষ পশুতে নেই ভেদ ঃ

বৃষ্টির মতো কোন বোমারু বিমান
এখানে কি নামবে না
ধুয়ে দিতে সব পেছুটান
খুলে দিতে স্বপ্নের চোখ
হয়তো তাহ'লে আমরাও কোনদিন
খুঁজতে বেরুব
ঠাকুমার হারানো নোলক
দু' চোখের কোলে কিছু সুপ্ত স্বপ্ন নিয়ে···

তিনটি কুল

আমার মা আমার হাতে তিনটি ফুল দিয়েছিলেন
একটি লাল, একটি নীল, একটি তার সাদা।
লালের নীলের নানান লেনদেন
চলছে আজো। নন্দনে সমাধা
হয়নি আমার যাত্রাগুলি, হয় না কারো বুঝি !
জীবন সোজাসুজি মাঠ পেরিয়ে যাবার মত নয়।
শাদা ফুলের দিন অনেক দূরে, অনেক উদাসীন
জীবন-নাট্য পেরিয়ে যেতে হয়।

নেশায় মেতে রক্ত করবীর দূর সমুদ্র, উচ্চশিখর পর্বতের কাছে
আমরা সবাই করে আছি ভিড়
কী এক যেন বুকের বিশ্বাসে।
আরক্ত ফুল আরক্ত এই দিনের জানালায়
কেমন করে উঠেছে ফুটে ! নগ্ন মোহানায়
জলের শব্দ—ভাঙছে দ্রুত জোয়ার। খুলে যাচ্ছে—খুলেছে সব দুয়ার।
সুনীল ফুলের নীরব নীলিমায়
অলংকৃত-তর আমায় অন্য এক মন জেগে থাকুক স্বপ্নে অনুক্ষণ
চেয়েছিলেন হয়তো আমার মা। কিন্তু হল না।
পলাশ-দিন এখন আমার চোখে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দ্রুত সোনা,
আমি এখন অন্য এক লোকে,
নীল আকাশের কিছু জানি না যে।
কেমন করে প্রত্যহের কাছে নীল আকাশের শান্ত নীরবতা
কেমন করে জ্বালিয়ে রাখতে হয়
আমায় তুমি শিখিয়ে দাও মাগো, জীবন-জয়ের আনন্দ-বিস্ময়।

শুভ্র ফুলের শান্ত সমারোহ আসে যদি, আমার নীল নদী
সমুদ্রের সঙ্গীতে সে যায়।

জীবন জয়ের সকল দুয়ারোহ পেরিয়ে যখন শান্ত নিরবধি
খুঁজে পাব, তখন তোমার দেয়া শাদা ফুলের
প্রতীক হব। তখন সব ভুলের
শান্তি হবে—মুছে যাবে চিহ্নটি পা'র ধুলোর।
তিনটি ফুলের শুদ্ধ সমাহারে জীবন আমার হয়ে উঠুক মা
চেয়েছিলেন। কিন্তু হল না।
ভেঙে যাচ্ছি ভেসে যাচ্ছি—অজস্র উচ্চারে।
তিনটি ফুলের একটি ফুটল না॥

অপরাজিতা গোনী

আমার জীবনে একটি গর্ব!

আমাকে আড়াল করে,
নিশ্চিত মৃত্যুর অনির্দিষ্ট জীবন পথে
আত্মোৎসর্গ করেছিলে তুমি।
বসুন্ধরার শান্ত—অচঞ্চল
প্রশান্তির আলোতে
অন্তরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে
তুমি হয়েছিলে দৃঢ়—কঠিন।

আবর্তিত ঋতুর আকর্ষিত আহ্বান
তোমার ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় ব্যর্থ।
ক্রমাগত বাস্তবের রূঢ় আঘাত
তোমায় বিচ্ছিন্ন করবার আকাঙ্ক্ষায়
নিমজ্জমান।

তবুও—
তুমি অচঞ্চল—তুমি শান্ত,
অম্লান—উজ্জ্বল তুমি
আমার জীবনে একটি গর্ব।

প্রদীপ রায়গুপ্ত

উইমেনস্ লিব্

পুনর্বাসন দিয়েছিলো পুরুষেরা, রূপ আমিও দিয়েছি ;
রূপ কি শিশুর খাদ্য শুধু অনর্গল দুধ, স্বভাবে ক্ষরিত
আদিতম কাল হতে জৈব এক মাতৃস্নেহ ? নারী ও পুরুষ
গাত্রবাসহীন হয়ে যখন ঘুরেছে বনে, প্রথাসিদ্ধতায়
সন্তান এসেছে কতো—নির্বিচারভোগ্য সেই বহুকামিতার
অন্য এক রূপ ছিলো, সেই রূপ সরলতা, সুসভ্যতা নয় ;
সভ্যতা মানবমনে বিকার ও জটিলতা এনেছে, বিস্ময়
চক্ষু থেকে লুপ্ত করে নিয়ে গেছে সুপ্রখর ; তাই পুরুষেরা
আদিম রূপের ক্ষুধা আবৃত দিয়েছে করে অন্তরালে পীন,
চিরব্যবহৃত রূপে এভাবে রহস্য জাগে, তোমরা নারীরা
তাকে পরাভব ভাবো ? অবিমৃষ্য অগ্নিকুণ্ডে বুকের দুকূল
ছুঁড়ে দিয়ে সাম্য চাও অবাস্তব, প্রকৃতির বিরূপতা করো ?
পরিপূরকতাহীন হয়েছে কি স্তন কেটে আমাজন নারী ?

এককূলে তোমাদের প্রস্তুত লালিত্য পোড়ে অন্যকূলে প্রেম।

অশোক মণ্ডল

ভালোবাসার বর্ষাতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে

কদাচিৎ বুকের বোতাম ছিন্নভিন্ন করে
দীপ্র হাওয়া
এবং উচ্ছল রোদ ;
আশৈশব হেঁটে এলুম দরিদ্র আকাশ
মাথায় নিয়ে।
যেহেতু এই শরীরের ভেতর
চিতাবাঘের মতো
লাফিয়ে বেড়ায় বাইশ বছর ;

কাউকে তোয়াক্কা করিনে এখন
ভালোবাসার বর্ষাতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আমি হেঁটে যাই তোমার দিকে
এবং সদালাপী দুঃখ।

পূর্ণেন্দুশেখর পণ্ডিত

অহরহ

অহরহ আমার বুকের ভেতর
আগুন জ্বলে ঃ আগুন জ্বলে ঃ আগুন জ্বলে ;—
সবকিছু সে অহরহ নষ্ট করে ঃ ধ্বংস করে ঃ
সবকিছু সে অহরহ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দেয় ঃ খাক্ করে দেয় ঃ
খাক্ করে দেয়।

অহরহ আমার বুকের মাঝে

বৃষ্টি ঝরে ঃ বৃষ্টি ঝরে ঃ বৃষ্টি ঝরে ;—
সবকিছু সে অহরহ সিক্ত করে ঃ স্নিগ্ধ করে ঃ
সবকিছু সে অহরহ নতুন করে সৃষ্টি করে ঃ নতুন রূপে গড়ে তোলে ঃ
নতুন ভাবে সাজিয়ে তোলে।

তাই তো আমি অহরহ সকল স্থানেই আগুন ঝরাই ঃ আগুন ছড়াই ঃ
আগুন লাগাই।
তাই তো আমি অহরহ সকল স্থানেই বৃষ্টি ঝরাই ঃ বৃষ্টি ছড়াই ঃ
বৃষ্টি জলে সমস্ত ভরাই।

তাই তো আমি অহরহ বিপ্লবী হই ঃ
অহরহ সকল স্থানেই বিপ্লবেরই মশাল জ্বালি ঃ বিপ্লবেরই নিশান তুলি।

তাই তো আমি অহরহ স্রষ্টা হই ঃ
অহরহ সমস্ত কিছুই নতুন করেই সৃষ্টি করি ঃ নতুন রূপেই গড়ে তুলি ঃ
নতুন ভাবেই সাজিয়ে দিই।

সুচেতা মিত্র

ঈশ্বরী

তোমার ললিত ভীরু অবজ্ঞার জন্যে আমি
প্রস্তুত হব না
কেননা ঈশ্বরী তুমি নির্দিষ্ট নিয়মে আছ
অন্দরের কোণে
তোমাকে ফেলি না দূরে রাগত ভাষণ দিয়ে
অনুতপ্ত নই
স্থির জানি প্রাসাদেই তোমাকে মানাত ভালো
অদ্ভুত ছলনা
কেন নিয়ে আসে এই দৃশ্যত কুটিল পথে
বিবেক দহনে।

এও সত্য জানি স্থির তোমার অবজ্ঞাটুকু
ভীরু ও মধুর
আমার ঈশ্বরী প্রেম। আমি অকরুণ নই
সংকীর্ণ দুয়ারে!

গোকুলেশ্বর ঘোষ

ফিরে আসে

কারো কোন ঠিকানা জানি না
দীর্ঘদিন লিখে যাচ্ছি চিঠি
ডাকবাক্সে ফেলে দিচ্ছি
ডাকটিকিট ছাড়া ;
এ-সব চিঠির ভালবাসা,
ফিরে আসে বেয়ারিং,
ডেড্-লেটার অফিস থেকে—

সীলমোহর
সুদ ও আসল।

অমিয়কুমার হাটি

কোয়ারাণটাইন

এমন উজ্জ্বল চোখে কে তাকায় মর্মের গভীরে
বিশ্বের মমতা নিয়ে ? ও ডাগর সাগরের তীরে
যে ভাষা মুখর হয়ে ঝরে পড়ে মাণিকের মত,
সমস্ত সত্তাকে করে চেতনার আবিরে আহত

কে ডাকে প্রদীপ্ত সেই আনন্দের সমুদ্র সৈকতে ?
বেদনা বিষাদ যত ধুয়ে দিয়ে বিছিয়ে অঞ্চল
বসিয়ে নিজের কাছে ছেনে নিয়ে অনুপল
জীবনে জীবন দিতে গান গায় ? বন্দীর জগতে
শৃংখল ভাঙার জন্য কবে শুরু হবে আন্দোলন ?
কোয়ারাণটাইনে আর কতকাল নির্বাসিত থাকি ?
হৃদয়ে রক্তের মধ্যে ডাক দেয় সকালের পাখি,
তোমাকে সম্যক দেখা, তারি জন্য উচাটন মন।

যাবোই, যেতেই হবে, হোক তা সে যে কোন মূল্যেই
কবিতা, তোমারি কাছে। ধ্রুবতারা হৃদয় খুললেই।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবন সম্পর্কিত চতুর্দশপদী

ফিরিবার বেলা বটে তবুও যায় না ফেরা এমন উজান
কিনারে নোঙর ফেলে একা একা শুধু এই জোয়ার-প্রতীক্ষা
দিনভর, সব ডিঙি চলে গেছে, সব হরিয়াল : সমস্ত ইলিশ ফের
নিজেকে সামিল করে বিরুদ্ধ স্রোতের, সোঁদাল খাঁড়ির ভিতর
সে-ডিঙা জামিন রেখে শুধু ভাবা—ফিরিবার বেলা ঐ বহে যায় ;
ডিঙির গলুই ভরা আঁশাল ইলিশ, রাতমান জল ছুঁড়ে
পাটাতনে জাল ঝাড়া আর ভরে গেছে রকমারী মাছ ও মাছলি

একাগ্র সঞ্চয়ে গেছে বেলা বহে, কখন ভাঁটার টান এসেছে নদীতে ;
তারপর শুধুই আকাশ, নীলাভ ধূসর, যেখানে বিশাল নদী
ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে ওই মিশেছে বিন্দুতে, ওভাবে নিঃশেষ হয়
দিনমান, হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাঁঝ ভাঁটার সান্নিধ্যে,
উবু হয়ে বসে শুধু ফেরার প্রতীক্ষা, উপরে হোগলার ছই,
নিচে যে গলুই ভরা চিকচিক চি-চিক সম্ভার—জলজ জীবন,
একাকী সঞ্চয় নিয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকা অসীম উজান ;

তাপস ভবাই

কিছু নীল স্বপ্ন

আমার দু' চোখ অতন্দ্র
চেতনা দুঃখের অন্ধকারে লীন।
সমস্ত শব্দের স্মৃতি ক্রমশঃ
একাকার আঁধারের জাফরি কাঁটার মতো।
হৃদয়ে খুঁজি কোন পদাতিক অনুভূতি
ভালবাসার,
কিন্তু শুধু খুঁজে পাই
জোড়াতালি পোষাকের অনিশ্চয়তা।
মেজাজ বিগড়ে যায়
আলোর প্রত্যয় খুঁজে পাইনে
হাহাকার ওঠে কেবল মনে ও মননে

এত পরিক্রমায় হয়ত অকস্মাৎ
ফিরে পাব হেলে-পড়া চাঁদের সম্বিত
আর কিছু নীল স্বপ্ন ॥

শঙ্কর মিত্র

শেষ বার বৃষ্টিতে ভিজে নাও

অকারণ অর্থহীন ইতিহাস নয়,
ঝড়ের ছোটাছুটি এলেমেলো
জানালা-দরোজা কানাকানি করে যায়
মুখোস খোলার দিনে।
জ্যোৎস্নার আলোয় ভেসে যায় ধূ ধূ মাঠ,
সাদা কুয়াশা জমে থাকে চোখের সামনে
কোথা থেকে অস্পষ্ট শব্দ মাঠে-ময়দানে টানে!
ধুলোয় আশীর্ণ, হা হা হা হি হি হি হাসির সভ্যতা
ভেঙেচুরে দুমড়ে যায় সাজানো-গোছানো বিশ্বাস
বাচ্চা ছেলের অবুঝ দাবড়ানিতে।
বন্ধ করে দেবে দাও
গোটা শরীর পিঠ লংরুথে মুড়ে
বৃষ্টিতে তবু ভিজে নাও শেষ বারে।

নিখিল বসু

কলকাতা

পকেট ভরা ধুলোমাখা হাসি, মলিন জীবনযাপন
আর বুকভরা থুথু, তামিল-তনয়ার
মনুমেন্টের কাছ থেকে মিছিল চলেছে, যেন এক
নিষ্প্রাণ পাইথন, বয়ে নিয়ে যায় গণরাজ—
অস্যার্থ পিপীলিকা।

ড্রাইভার ঘুমিয়ে নেয়, স্টিয়ারিঙে মাথা রাখা।
বুট পালিশ, ময়ূরের কর্কশ চিৎকার, সচিত্র যৌনজ্ঞান
তারও পরে
ট্র্যাফিক বুড়োর শ্যাম-চোখ···

সে আমার কাছে আসে, স্মার্ট এক বেশ্যার মতন
মুঠো করে ধরে জামা, গরুর চোখের মতো ম্লান ঃ
'এই ঠোঁট জাল নয়, এই স্তন মাংসল···'

আকাশে চিলের মতো, ওড়ে শুধু রাঙা নখ, একদিন
এই নখ তার খুব প্রিয় ছিল।

সুমন্ত্র সরকার

সেই যুবক

রঙীন ক্যাকটাসের পাশে কারও ঠোঁট ধনুক
ভাবা যায় কল্পনায়, ঝিরঝির বৃষ্টিতে ছন্নছাড়া যুবক
প্রেমিকার মুখে হাসি পেতে চায়·····
এসব কিছুই কেউ কেউ অবান্তর ভাবে
'আমি', আমরা কি বুঝি সেই ব্যথা ?
সেই যুবক অকিঞ্চন-এর বুক ভরে থাকে
সুকেশী প্রেমিকার কাছে ভালবাসা
নিদাঘের দাবদাহ হতে পারে,
দিব্যি বেঁচে থাকে তার হাসিমুখ
হাল ফাসানের কাছে মাথা উঁচু করে
বটগাছের মধুর মিলন খেলে যায়···
ঝিরঝির বৃষ্টিতে ছন্নছাড়া সেই যুবক।

আহা, যুবকেরা কি অসহায়!

শ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সময় মাত্র কয়েক মিনিট

সময় মাত্র কয়েক মিনিট—
এরই মধ্যে চঞ্চলতা
অবাক হওয়া, হারিয়ে যাওয়া,
সময় খুবই অল্প জেনে
আমিই ফকির আমিই রাজা।

এই সময়েই ভীষণ বৃষ্টি, ভীষণ হাওয়া
দুই হাতে দুই মুক্ত গোলাপ
সাজিয়ে রাখা, স্বপ্ন দেখা।
এরই মধ্যে ঝড় আসবে কূল ভাঙবে,
বুকের মধ্যে সিংহাসনে অপহরণ এই সময়ে।

এরই মাঝে ভালোবাসা ঘৃণার আগুনে
জ্বলতে থাকবে পাশাপাশি,
দারুণ রোদে হাজার মানুষ
কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ,
মিছিল করে এই সময়ে
ভালোবাসায় সামিল হওয়া।

সময় মাত্র কয়েক মিনিট—
পেরিয়ে গেলেই দারুণ একা॥

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃসঙ্গতা, এখন অসুখ

নীরোগ দেহকে নিয়ে ইচ্ছেমতো ঘোরে ফেরে সমস্ত মানুষ
প্রয়োজন হলে কেউ ঘরে ফিরে আসে কেউ পথের ছায়ায়…
গাঢ় উৎকণ্ঠায় বাঁধা পড়ে যায় এই সংসার-যাপন
শরীর অসুস্থ হলে গৃহঘেঁষা সকলেই শঙ্কায় আকুল—
অন্তরীণ একাকীত্ব গ্রাস করে অন্ধকারে বিপন্ন-হৃদয়
সময়ের ব্যবধানে অভিমানী হয়ে ওঠে শব্দ-স্মৃতিগুলি
কোন অভিযোগ নেই, অস্থির শয্যায় শুয়ে নিস্পৃহ-বিষাদ
সহসা কে গ্রন্থিগুলি খুলে নেয় চলমান পেশল হাঁটুর
আনত বন্দীর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে অরব নিনাদ
চলিষ্ণু মানুষ দেখলে ঈর্ষা জাগে সংসার সান্ত্বনা-বিহীন
কেবল অনুচ্চ কণ্ঠে মন বলে সবই দ্যাখো বিশ্বাসঘাতক।
অসুস্থতা জীবনের স্বল্প বিরতি দুঃসময়ে অনড় কৌতুক।

পায়ের তলার মাটি

পায়ের তলার মাটি
রক্তমুখী সর্পিলের মতো
আমাকে গিলতে চায়
চারিদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
আমাকে ঘিরে ফেলে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য
ভালোবাসার প্রতারণা
সারা দেহ ক্ষত বিক্ষত করে তোলে
যৌবন পাথরে মাথা ঠুকে
কিংবা ঐশ্বর্যের বিলাসে
ডুব দিতে চায়।

শান্তশীল দাস

অভিনয়

পর্দায় অভিনয় দেখি, আর
সেই অভিনয় করি জীবনের রঙ্গমঞ্চে।
যা-আমি সত্যি নই,
তাই হতে হয় প্রতিদিন।
'যা-আমি' তা ঢেকে রেখে দিই
নানা ছদ্মবেশের আড়ালে।
সবাই বাহবা দেয়—মঞ্চে ওই সার্থক অভিনেতা
যেমন বাহবা পায়। আমিও তেমনি
কত স্তুতিবাক্য নানা বিশেষণে ভরা
পাই প্রতিদিন, পাই সকালে সন্ধ্যায়।

এ সব কত-যে মিথ্যে, বুঝি আমি
নিজের একান্তে এসে। মুখ ফুটে তবু কিছু
বলতে পারি না। করে যাই অভিনয়।
করে যেতে হবে চিরদিন।
আর সেই বাহবাও পেতে হবে—
সেও আর এক অভিনয়।

চিত্রভানু সরকার

শেষ বিকেলের পাখি

আমার কৈশোর এল
জোয়ারের টানে
আবার কখন যে
চলে গেল ভাঁটায়
আমার স্বপ্ন আশা-আকাঙ্ক্ষা
ফিরে এল স্মৃতির পাতায়।

দীপক কর

অভিজ্ঞতার সালতামামি

সব মানুষকে এখন আমি
ভীষণভাবে চিনে নিয়েছি
অভিজ্ঞতার সালতামামি
কষ্টিপাথর একনজরে-ই।

শব্দফন্দ আর লাগে না
তাসে তাসে রঙ মেলাতে
ঘুম থেকে আজ উঠে পড়ি
এলার্ম বাজার অনেক আগে।

পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী

আপেল বাগানের রহস্য

আপেল বাগানের রহস্য আজ আমি উন্মোচন করব।
যে রহস্য কেউ কোনদিন ভেদ করতে পারেনি।
পুরস্কার কিছু নেই
কেউ এসে আমাকে সম্মান করছে না, খুনি তুমি ভয় পেও না,
রহস্যটা লেখা আছে ডাইরির পাতায়।
আজ কত তারিখ ?
আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর।
আমার প্রথম ও শেষ রহস্য উন্মোচন দিবস।

হরিপদ দে

অসময়ে চেনা মুখ

যে সন্ধ্যায় দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইনি
হাত বাড়িয়েছিলুম
বন্ধু প্রতিবেশী আছে জেনে
অনেক প্রহর কেটে গ্যাছে জানি না অন্ধের যষ্টি কেমন
জানি না কোন্ নিরিখে বন্ধু ও আপনজনকে জেনে নিতে হয়।

আলোর ইশারায়
চিৎকার ক'রে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলাম
কিন্তু জিহ্বা আমার ভূতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট
অথচ কেউ প্রতীক্ষায় থাকে নি।
অসংখ্য মুখ চকচকে চোখ ভিড় করেছে
স্নেহ ও সান্ত্বনা দেওয়ালী পোকার মত
আমার চতুর্দিকে অবিরাম চক্কর মেরে ঘুরে চলেছে
বারবার বলতে চাই যে-যেখানে ছিলে
থাকো।
আমি কি তোমাদের ভুলতে পারি ?
কিন্তু জিহ্বা আমার ভূতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট।

বিমল ভট্টাচার্য

সিঁড়িঘরে অবিশ্বাস

চিরকাল কেউ বসে থাকে না ; একদিন
যায়
নদীতে গো-রক্ত ধোয়
খুলে ফেলে বর্ম চাপরাস
উবু হয়ে
সোনা পাখিটির কাছে পাঠ নেয়

তুমিও দাঁড়াবে শস্য রোদে
সেখানে তোমার নামে
জড়োয়ায়
বড় রমণীয় হবে
নারী

জড়িবুটি স্বপ্ন মেলে দেবে
ঘন হবে ছিমছাম চিবুক
দাঁড়িয়ে রয়েছে রোদে
জেল্লাদার

রোজ যাই যাই
সিঁড়িঘরে অবিশ্বাস
দেউড়ী পেরুতে রোজ সন্ধে হয়ে যায়।

জীবতোষ দাস

কেন এই কাহিনী বর্ণনা

মানুষগুলো, যে যার নিজস্ব কাহিনী বর্ণনা করতে করতে
অফিস থেকে বাড়ী, কারখানা থেকে বস্তী
ক্ষেত থেকে চালাঘর, চালাঘর থেকে ফুটপাথ
এমনি করে রেসের ঘোড়ার মতোন

অথবা লংপ্লেয়িং রেকর্ডের মতোন ঘুরে ঘুরে
আওয়াজ বেজে চলেছে।

আপনমনে একে অপরকে শুনিয়ে যাচ্ছে
যে যার নিজস্ব কাহিনী।
তবুও কাহিনীগুলো কখনও পৃথক,
কখনও একদম মিল
মনে হয় পৃথিবীর মানুষগুলোর কাহিনী এমনিই মিল।
তবে কেন কাহিনী বর্ণনা ?
নাকি মনের অসুখ, নাকি মনের সুখ
নাকি আত্মতৃপ্তি ?
বুঝি না, এখনও কেন এই কাহিনী বর্ণনা !

পূর্ণচন্দ্র মুনিয়ান

যে ভাবে আমাকে করো কবিতায় নতুন যোজনা

যে ভাবে আমাকে করো কবিতায় পরিচিতি জুড়ে
আমি তবু বেঁচে থাকি নির্বাসনে অতুল বৈভবে

বুকের মাংস শুধু চন্দ্রভুক পারাবত ঐ
কেটে খায় নির্দ্বিধায় পচাপুচি গলিত পাঁপড়
খুঁজে নেয় আশেপাশে জঙ্গলে খানায়
কোথায় মাছের গন্ধ—চুপড়িতে আঁশ…
এ ভাবেই একদিন গালগল্পে ইতিহাস হাঁটে
জটিল নদীর বাঁকে ভেসে যায় হরিণের শিং
তবুও কবিতা আসে কবি নাকি জামা খুলে বিছায় উঠোনে
বেজন্মা ফড়িং উড়ে এদিক ওদিক
ফেলে যায় বাতিল পালক এবং বেদনা
কবিতার ছন্দ জেনে তবু করো কবিতায় ভুল !

যে কবি জন্মালো না শেষ রাতে গজমজে ঘুম
হায়রে নাবাল ভূমি এতকালে নাই তবু বাদামুখো নরম শরীর···
যে ভাবে আমারে করো কবিতায় নতুন যোজনা
তবু আমি জেগে থাকি কবিতার নাভির বাঁধনে
বঙ্গোপসাগর হ'তে ছুটে যাই অন্যদিনে
অন্যদিন পরিচয় আমার জানে না।

মণিপদ্ম দত্ত

কতকগুলো মুহূর্ত এবং আমি

কতগুলো বছর,
আমার ফেলে আসা অতীতের কতগুলো মাস,
কতগুলো দিন, আর অনেকগুলো মুহূর্ত ;—
গোলাপের মতো রাঙা, মাধবীলতার মতো লজ্জিত
আকাশের মতো নীল দূর্বার মতো সবুজ
আর প্রান্তরের মতো বাঁধন ছেঁড়া !
প্রতি মুহূর্তেই
যথার্থতার ভরপুর, শ্লীলতায় সুন্দর, উত্তেজনায় পূর্ণ, অনুভূতিতে সাবলীল
স্বপ্নিল জগতে টেনে নিয়েও ঢেকে দিত
প্রবৃত্তির উদগ্র আবেগ, স্বাচ্ছন্দ্যের আলোকে !···
তাই স্মরণে শাশ্বত বরণে ভাস্বর···
তার স্মৃতির আস্বাদ বছরের পর বছর।
এখন খুচরো পয়সার মতো দিন গুণে চলার আনন্দ ;
শুভ্রতার আবরণে এক ফোঁটা কালি—
জীবনের ফাঁকা ঘটে, গতিশীল বর্তমান !

বাক্-সংযম

কথাটা এভাবে বল্‌লেও চলে
সেভাবে বল্‌লেও চলে
এখন বল্‌লেও চলে
তখন বল্‌লেও চলে
আজ বল্‌লেও চলে
কাল বল্‌লেও চলে
চেঁচিয়ে বলাও চলে
ফিস্‌ফিসিয়ে বলাও চলে
—একদম বে-খেয়ালে
কথাটা না বল্‌লেও চলে ॥

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

স্বভাব

কিছু সময় গড়িয়ে নিচ্ছি
মানে এই নয়
গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবার
অপূর্ব সুযোগ এলে
আমি বেডসাইড টেবিলের দিকে হাত
বাড়িয়ে দেবো না। কিছু সময় ঘুমিয়ে নিচ্ছি
মানে এই নয়
প্রভাতের আলো চারিদিকে
ছড়িয়ে পড়লে আমি আঙুলের ডগায়
দাঁতগুলি ঘষতে ঘষতে
প্রাতঃরাশের সন্ধানে এগিয়ে যাবো না।

কিন্তু
আমার বেলায়
তোমার এইরকম কিছু ভুল
সময় সময় বড়ো মারাত্মক হ'য়ে ওঠে—
অদ্ভুত কৌশলে
তুমি নিজেকে শুধরে নাও—যেন এটাই নিয়ম
যেন এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক ঃ

এবং কিছুতেই তুমি আমাকে পাল্টাবার সুযোগ দাও না !

আজিজ চক্রবর্তী

সিন্ধুভূমে পরমাণু ক্রিয়া

এখন সিন্ধুভূমে লাল সূর্য উঠে আসছে,
ব্রতাঙ্গনা-বসুধারা কুমারীরা সব—
আশার বাগানে অষ্ট তাঁরা সন্ধানরতা।
আমি তার্কিক হতে চাই না,
তাতিকে আমার স্থির বিশ্বাস জেনো।
পূর্বাশা নক্ষত্রে অস্টবসুরা সব
সাক্ষী হবে নিশ্চয় !
অন্ততঃ ছ-হাজার অতীত তাই বলে।
এখনো মহেঞ্জোদড়ো থেকে কন্যাকুমারীকা—
অসংখ্য ক্ষত বুকে আরক্ত বিস্ময় !
চলো শিশু ফিরে যাই সভ্য সূর্যের দেশে।
এক-একটা বসন খুলে—
প্রত্নবিদেরা বয়স্ক চোখে
স্বীকার করে নেন আমার সভ্যতার ইতিহাস।
অথচ আবাগী সতীনে আজ উদ্ধত স্পর্ধা
সোল্লাসে—অন্তজ শিশু পরমাণু ক্রিয়া করে।
চেড়ীতে ভীতা নই আমি জানকী,

প্রত্যন্ত মসীরেখা দিক্ চক্রবালে
নিজভূমে পরবাসী অশরীরা খেলে।
লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পাপ শিশু তোমার
যাত্রাপথে ঈশ্বরের আশীর্বাদ
পাথেয় রইলো সাথে আমার প্রিয় আশা
সবুজ প্রান্তরে পূর্বাশা তুমি শান্তির দূত
সিন্ধুভূমে স্বাগত পরমাণু ক্রিয়া।

নির্মল হালদার

ঘর ছাড়িয়ে হাত ছাড়িয়ে

হারাই আমি হারাই ঘর হারিয়ে পালাই
ঘরের ছায়া হারিয়ে আমি
পথের ছায়ায় দাঁড়াই
নদীর সঙ্গে সাগর
আমার দিকে হাত বাড়াই
এখন আমায় ডাকছে কেউ
সাগর থেকে উঠছে ঢেউ
ঘর ছাড়িয়ে হাত ছাড়িয়ে
পালাই আমি পালাই
মন জড়ানো দুয়ার ছেড়ে
পথের কাছে একটি চুমু চাই

হারাই আমি হারাই ঘর হারিয়ে পালাই।

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজীকর

সোনার হরিণ ইচ্ছে হ'য়ে
ছুটে মরে
পেছন পেছন

শিকার খোঁজা ভিজে বেড়াল
কে হে তুমি
স্বপ্ন দেখাও কল্পতরুর ?

অন্ধকারে ছায়া গুণি
শব্দ শুনি
মায়ের বুকে আছড়ে
পড়ে শিশু।

ফুলফোটা সেই গাছের নীচে
আলোর পাখী
আসবে বলে কতক্ষণ আর
সময় গুণে
কাটিয়ে দেবে বেলা ?

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

কাক

হঠাৎ জমলো কিছু নীল মেঘ
বৃষ্টি এসে ভেজালো পাঁচিল
ভেজে কৃষ্ণকলি ও দোপাটি
ভেজে মাটি।
ঘড়িতে চারটে বাজে যেই
অমনি দোলনচাঁপা ফোটে
ঠোঁটে নিয়ে জল
কোথাও শুষ্কতা নেই, অবিকল
বর্ষার নিসর্গচিত্র। শুধু একলা কাক
পাঁচিলে পালক ঝাড়ে বার বার।
ও কি শুধু শুষ্কতা বাঁচায়, নাকি
ব্যক্তিত্বও ? অথবা নিসর্গ জুড়ে ও-ই
থেকে গেল একমাত্র ফাঁকি ?

এই পাওয়াটা

যীশুখ্রীস্টের হাতের পাতায়
রক্ত ছিল দুই ফোঁটা
বললাম, দাও আশীর্বাদের বদলে।
যীশুখ্রীস্টের বুকের মধ্যে
রক্ত ছিল এক ফোঁটা
বললাম, দাও ভালবাসার বদলে।

ডানদিকে হেলিয়ে মাথা শ্রাগ্ করলেন তিনি
এবং দিয়ে গেলেন।

সেই হোল ভুল।
সেই হোল ভুল মানুষ-নামক আমাদের
বিকল্পে সন্তুষ্ট থাকা—কাগজ-কাটা ফুল।
যা চেয়েছি তাই পেয়েছি—ভালোবাসার বিকল্প
মমতাবান মানুষ নামে বেঁচে থাকার বিকল্প।
তা-ও তো প্রাপ্য নয়, তবু
কিছুই না পাওয়ার চেয়ে এই পাওয়াটা মন্দ কী।

কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতল দীঘিটা স্টেশান হোয়ে গেলো

আমার বুকের মধ্যে একটা শীতল দীঘি ছিলো
গাছের কিম্বা কোনো উড়ন্ত ডানার ছায়া
তার ফ্রেমে সারাদিন আঁটা থাকতো

একদিন হাল্কা জ্যোৎস্নায় দীঘির কালো জলে
চুপিচুপি চতুর্দশীর চাঁদ মুখ দেখছিলো
আর খান্ খান্ হোয়ে যাচ্ছিলো

আমি তখন নরম বালিতে খেলা করতে করতে এক সারি
ডোরাকাটা পায়ের ছাপ চিক্‌চিক্‌ করতে দেখলাম
আর দেখলাম জলের কোল ঘেঁষে আমাকে
এক গুচ্ছ লাল স্বপ্ন নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে

দীঘির কালো জলে চাঁদটা তখনো ভাঙছিলো কেবলই ভাঙছিলো
তখনো একটা উড়ন্ত চিলের ডানার ছায়া
জ্যোৎস্নায় দীঘির জলে কেঁপে কেঁপে ছায়া ছায়া হোয়ে যাচ্ছিলো
এমনি করে একদিন
শীতল দীঘিটা শেয়ালদার স্টেশান হোয়ে গেলো

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের রিক্তস্মৃতি মুখ বলতে প্রতিটি আদল

এ অরণ্য-পান্থশালা রমণীয় স্মৃতি কোথাও চিত্রিত নেই
আমাদের সব ইচ্ছা মাটির খেলনার মতো ক্রমায়ত ভেঙ্গে যাচ্ছে
ভেঙ্গে যাচ্ছে সমস্ত নিখিল ভুবনপ্রতীম মায়া শব্দ-শব্দাবলী
প্রথম প্রত্যুষে যেন হেঁকে যাচ্ছে কোনো বৃদ্ধ ফেরিঅলা
নিলাম বাজারে

আমাদের রিক্তস্মৃতি ধব্‌ধবে বরফকুচির মতো ভালোবাসা
প্রিয়তম মুখ
কে এখানে নিয়ে এলো নিলাম বাজারে !
হৃদপিণ্ডে দগ্‌দগে ঘা, মুখ বলতে পরিচিত প্রতিটি আদল
এমন বিকৃত করে কে এঁকেছো কোন্‌ শিল্পী
কে এখানে নিয়ে এলো নিলাম বাজারে !

এমন অদ্ভুত করে এ অরণ্যে ডুগডুগী বাজাচ্ছো কেন
কেন যে এখনো একা বৃক্ষের আড়ালে খুঁজছো সমর্পিত ছায়া
শান্ত হ্রদ কিংবা এই গরবিণী ঝর্ণার কাছে অন্তত একবার
এগিয়ে এসো

সমস্ত মলিন স্মৃতি চাপ চাপ রক্তে ভেজা মুখ এই জলে ধুয়ে দেবো
এখানে তোমাকে পেলে
লটকানো নিলাম পরোয়ানা আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বো
আমাদের রিক্তস্মৃতি মুখ বলতে পরিচিত মানুষের প্রতিটি আদল
এমন বিকৃত করে কে এঁকেছো কোন্‌ শিল্পী
কে এখানে নিয়ে এলো নিলাম বাজারে !

সুনীল হাজরা

কী হে মণিময়

ঠিক এইভাবে তুমি জীবনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
দেখে নিও। কখন কী ভাবে তুমি নতজানু হও
কার সাথে কত ভাবে যাচ্‌ঞা কর কেমন সহজে,
অথবা বিক্রীত কর অনায়াসে হেসে।

কোনদিন যদি তুমি হঠাৎ নিজেকে দেখে ফেল,
সেই ভয়ে অন্ধকারে নিয়েছো আশ্রয়
কার ভয়ে ! প্রবেশ নিষেধ লিখে রাখো তুমি
স্বাধীন চিন্তায়।
কেন তুমি দরজায় দরোয়ান রাখো পুষে ?
যদি কেউ হুট করে ঢুকে পড়ে ঘরে, সেই ভয়ে ?
কাকে ফাঁকি দেবে তুমি, হ্যাণ্ডনোট কাকেই বা লেখাবে ?
তবু কিন্তু লোকজন ঢুকে পড়ে পাহারা এড়িয়ে,
দরজায় ঘা মারে জোরে ; প্রতিরোধ ভেঙেচুরে যায়
কী হে মণিময় ? নিজের অস্তিত্বটা আজ চিনতে কষ্ট হয়,
ভয়ে ভয়ে মুখ তুলি, ঘাম দেয় সমস্ত শরীরে,
কে ওখানে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে অন্ধকারে ফের ডুবে যায়,

প্রতিবিম্ব চূর্ণ করে ভেঙে পড়ে রিক্ত বেদীমূলে।

বাসুদেবপুর : ১৯৭৩ বাংলা বন্ধ মনে রেখে

সেণ্ট হেলেনায় যেনো আমাকে নির্বাসন দেওয়া হয়।
কেননা আমি হতে চাই—চেঙ্গিস খান, তৈমুরলঙ। হিটলার।
পৃথিবীতে খুনী মানুষের সম্মান চিরদিন থাকে। রিসার্চ করে
ঐতিহাসিকেরা। গবেষণা করে, ডিগ্রী বাড়ায়। পুরস্কৃত হয়
সভা সমাজে। সুতরাং ভাল মানুষ সেজে বেঁচেবর্তে থাকা
সুখকর নয়।
আমি এই বাংলাদেশের মানুষ। হা—অন্নের দেশ
ক্ষুধার তাড়নায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলে গুলি খেতে
হয়। হে বঙ্গেশ্বর। তোমার বেতার ভাষণ।
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এটা
ইতিহাস। তুমি আমরা একদিন ফসিল হয়ে
গেলে থিসিস করবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে। আমরা
সেই সুবাদে কৃতার্থ হবো সুতরাং হে ঈশ্বর।
সেণ্ট হেলেনায় যেন আমাকে সমাধি দেওয়া হয়।

অমলতাস একটি ফুলের নাম

অমলতাস একটি ফুলের নাম।
সোনা রংয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ কথার মত।
সমস্ত গাছ ভরে একদিন
আমি যা ফুটে থাকতে দেখেছিলাম
এবং তখন আমার মনে হল
আমার কোন দুঃখ নেই—এ পৃথিবীতে কোন দুঃখ নেই,
কোন পাপ নেই কিংবা পাপবোধও নেই।
আমি দেখেছি অমলতাস তার সোনালি আভায়
সমস্ত গাছ আলো করে আছে, সমস্ত পথ আলো করে ফুটেছে,
সমস্ত পাহাড় আলোয় উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

অমলতাস একটি ফুলের নাম।
সোনা রংয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ ইচ্ছের মত।
আমার সমস্ত আকাশ ভরে একদিন যা ফুটেছিল
এবং তখন আমার মনে হত আমার কোন দুঃখ নেই
কিংবা পৃথিবীতে কোন দুঃখ থাকা সম্ভব নয়
কারণ সমস্ত পৃথিবীতে এখন ফুটে আছে অমলতাস
তার সোনালি ইচ্ছের গুচ্ছ গুচ্ছ প্রতিশ্রুতি নিয়ে
এবং আমি, পৃথিবী ও অমলতাস বস্তুত একই আনন্দের
বিভিন্ন প্রকাশ।

অমলতাস একটি ফুলের নাম।
অমলতাস… একটি ইচ্ছের নাম…
যা আমি একদিন হতে চেয়েছিলাম।

বিদেশী কবিতা ঃ

ইতালী

Francesco Petrarca — ফ্রানচেস্‌কো পেত্রার্কা

[ইতালীয় কাব্যে যত প্রেমকবিতা রচিত হয়েছে পৃথিবীর অন্যত্র হয়ত তত হয়নি। দান্তে, লিওপার্দি ইত্যাদি নামের পাশে পেত্রার্কা এমনি একটি নাম যা নিখিল মানুষের চিত্তগগনে জ্বলজ্বল করে। পেত্রার্কার (১৩০৪—১৩৭৪) মৃত্যুর পর ছশো বছর অতিক্রান্ত হ'ল। সেই মহান মানুষটির স্মরণে, তাঁর অপরূপ হৃদয়বিনিময়ের কথা ভেবে এই বিখ্যাত কবিতাটি অনূদিত হ'ল।]

চিন্তা থেকে চিন্তায়, পাহাড় থেকে পাহাড়ে

[Di Pensier in pensier, di monte in monte]

চিন্তা থেকে চিন্তায় পাহাড় থেকে পাহাড়ে প্রেম
আমাকে দেখায় পথ ; আমি যে দেখেছি পরিচিত পথরেখা
নীরব গভীর জীবন থেকে যায় সরে।
বিচূর্ণ তট, নদী বা ঝর্ণা যদি এইখানে বহমান
তুঙ্গ দুইটি চূড়ার গভীরে উপত্যকাটি ছায়াঘেরা
তবে এইখানে জুড়োয় আমার ভয়াতুর আত্মাটি ঃ
প্রেমের গভীরে ইচ্ছায় অনুগত
হাসে আর কাঁদে, ভয়ে বা আনন্দে।
মুখশ্রী আমার চলে পশ্চাতে আত্মা দেখালে পথ
বিচলিত এই—পরক্ষণেই মেঘের মতন মুক্ত
ভঙ্গীটি তার অতি অল্প সময়ে সংগ্রহ করে গতি।
সমব্যথী কেউ তখন দেখলে বলত আমাকে ডেকে
জ্বলছে এ জন অসহায় হয়ে ভাগ্যের ক্রীড়নক।

উতলা চুড়োয় তিমির নিবিড় বনে, বিশ্রাম খুঁজে পাই ;
জনতাদূষিত প্রতিটি শহর ও গ্রাম শত্রুর মত দুচোখের পীড়াকর।
প্রতি পদক্ষেপে প্রিয়ার নূতন স্মৃতিগুলি কয় কথা
যে যাতনা আমি অনুভব করি শুধু ভালোবেসে তাকে
এখানে বিশদ হয়। যখন বদলে দেব
যুগপৎ এই মধুর এবং তিক্ত জীবনধারা
নিজেকে বলব আমি প্রেমই তোমাকে বাঁচায় এ সুধাদানে,
টেনে নিয়ে যায় অনুকূল কোন আগামীকালের দিকে,
আপনাকে তুমি ঘৃণা কর তবু আর কেউ তাকে এই মুহূর্তেই
হয়তো বা ভালোবাসে।
আমি চলে যাই—বাতাসে দীর্ঘশ্বাস !
এ যদি স্বপ্ন নয় তবে সে ফলবে কবে ?
দেবদারু বীথি নমিত পাহাড় পেতেছে সান্দ্র ছায়া
এইখানে কিছু থামি
কাছাকাছি কোনো পাথরের বুকে চকিতেই আঁকি মুখ তার মধুমাখা।
আবার যখন ফিরে পাই সম্বিৎ
চেয়ে দেখি আমি আবক্ষপট করুণায় গেছি ভিজে
ডেকে বলি, আহা হৃদয় আমার কোনখানে এলে নেমে, কাকে
এলে পিছে রেখে ?
চিন্তাকে তবু নিয়োজিত করি প্রথম প্রতীক্ষায়
তার প্রতি চেয়ে অপলক চোখে আত্মার কাটে দিন
মনে হ'য় যেন সেই ভালোবাসা বসেছে বুকের কাছে
রচিত ছলনা ঃ তবু মন হয় আনন্দে বিহ্বলা
দশদিগন্তে তাকে দেখি আমি দেখি যে স্বপ্নরূপা।
হে মহান মায়া ! তোমাকেই শুধু চাই।

আমি যে দেখেছি প্রতিবিম্বন তার (জানবে না কেউ এই কথা কোনোদিন)
জলের স্বচ্ছ আঙ্কিক ছুঁয়ে অথবা সবুজ ঘাসে,
গাছের ডাল বা মেঘের শুভ্র পাল চুয়ে নেমে আসে।
ছলছল তার ম্লান রূপ দেখে হয়তো ভাববে লেডা

মর্মজাতিকা আজকে আহত বুঝিবা বেদনাঘাতে।
নির্জনতম যে নদীর তীরে ছায়া ঝরে পড়ে মোর
এইরূপ স্থানে এলে সবচেয়ে বেশি সুকোমলভাবে
চিন্তা আমার জড়িয়ে ধরে যে তাকে
বাস্তব এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেয় স্বপ্নের মায়াজাল
তবুও সেখানে অবিকল বসে থাকি ; ঠাণ্ডা নিথর, জীবন পাথারে
মৃত পাথরের মত
একটি মানুষ ঃ যে মানুষ ভাবে, যে মানুষ লেখে, কাঁদে।
সীমাহীন বাসনা টেনে নিয়ে যায়
তুঙ্গতম ও মনোরম এক পাহাড়চূড়ার ধারে
দ্বিতীয় কোন পাহাড় যেখানে কখনো ফেলে না ছায়া।
এইখানে এসে চোখ মেলে নিই দুঃখের পরিমাপ,
ক্রন্দন করি মনোভারটুকু হাল্কা করব বলে।
এইভাবে কাটে তিক্ত ও কালো কুয়াশার অভিশাপ।
দেখি আর ভাবি
কোন্ ব্যবধান ওই অপরূপ মুখখানি থেকে আমাকে রেখেছে দূরে ;
পাশাপাশি আছি তবুও এমন অধরা মাধুরী তুমি।
কোমল কণ্ঠে আত্মাকে ডেকে বলি ঃ হায় অভাগ্য কি কথা ভাবছ তুমি ?
হয়ত এখনি অদূরে দাঁড়িয়ে ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস
তুমি দুর্লভ বলে। এই চিন্তাই সতেজ হাওয়ার
সঞ্চার করে কিছুটা হৃদয়মূলে।

কোথায় আমাকে পাবে তুমি হায়, কোথায় আমার গান ?
ওই পাহাড়ের পারে ; আকাশ যেখানে স্বচ্ছ ও সুমহান,
তন্বী নদীটি চলনে বলনে হয়তো কিছুটা দ্রুত,
সুরভি গুল্ম হাওয়াকে পরালো মন্দ মধুর সাজ,
সেইখানে আছে হৃদয় আমার শুয়ে
তারি পাশে ঠিক ঃ একদা যে নিল হরে'।
এইখানে তুমি খুঁজে দেখো পাবে আমার ভস্ম শেষ।

—অনুবাদ ঃ মঞ্জুভাষ মিত্র

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

হিন্দী

স্বদেশ ভারতী

["রূপাম্বরা" সম্পাদক তরুণ হিন্দী কবি স্বদেশ ভারতী কবিতা, ছোট গল্প এবং উপন্যাস তিনটি ক্ষেত্রেই সমান দক্ষ। সর্বভারতীয় কবি মহলে স্বদেশ ভারতী একটি পরিচিত নাম।]

ছায়া

সর্বত্র
আমি যেখানেই যাই না কেন,
স্বপ্ন
আমার অনুগামী হয়
উত্তর মধ্যাহ্নের প্রতিচ্ছায়ার মতো

বিকেল গড়াবার সূচনা দিচ্ছে
পশ্চিমা আকাশ
এবং কিছুক্ষণের মধ্যে
রাতের মিশমিশে ছায়া
আধখোলা জানালা দিয়ে
লাফিয়ে পড়ে
আমার গায়ে
তার ধারালো নখের আঁচড় রেখে যাবে।

আমি চমকাবো না।
বিস্মিত হই-ই না—কেন না
ইদানীং
এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আচ্ছা, কতদূর পর্যন্ত এ ছায়াটা
আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করবে ?

মেঘে ভরে গেলে,
অন্ধকার বেড়ে গেলেও
ও আমার পেছন ছাড়ে না,
এমন কী
আমার মাথায় চড়ে বসে
আমার চোখ দুটোকে
দুপায়ে মাড়িয়ে দেয়—এবং ওর ভারে
আমার মাথার শিরা
লম্বা হয়ে টনটন করতে থাকে—
চোখের সামনে কুয়াশা ছেড়ে যায়।

মনে হয়
এখুনি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।
বন্যা কবলিত ঘরবাড়ির মতো
হুড়মুড় করে
আমার অহংএর দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে,
চোখে পড়ে
মরে ফুলে ওঠা, দুর্গন্ধময়, জন্তু মানুষ।

এবং তখন
দেখতে পাই ঃ

বেয়াড়া স্বপ্নটা
ওখানেও
হাতছাড়া করে না আমাকে।

এক নগর থেকে অন্য নগর পর্যন্ত
এ-গ্রাম থেকে ও গ্রাম পর্যন্ত
মরা নদী—পাহাড়েরও
কোথাও এমন জায়গা নেই—
সেখানে
ভীড় থেকে আলাদা হলে
ও আমাকে খুঁজে বার না করতে পারে !

—অনুবাদ ঃ প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ

বিজ্ঞপ্তি

এক নামের দুজন লেখক অনেক সময় পাঠকদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে পড়েন। অন্যদিনের পাঠকদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, গত বর্ষা সংখ্যায় প্রকাশিত "এবার সংগ্রাম ঃ এবার মৃত্যু" কবিতার কবি সামসুল হক ও 'প্রটোপ্লাজম' 'চলচ্চিত্র', 'ডায়েরী' ইত্যাদি কাব্যের লেখক কাকদ্বীপের সুপরিচিত কবি সামসুল হক এক ব্যক্তি নন। পূর্বোক্ত কবি হুগলীর বাসিন্দা।

কুচবিহার

পরেশ সোম

জন্ম ১৩৩৮ সনের ১৫ই পৌষ ঢাকার বেয়রা গ্রামে। কিন্তু আজ তাঁর বাসভূমি বেছে নিয়েছেন কুচবিহারের পাটাকুড়ায়। জীবন সম্বন্ধে গভীর চেতনা, চিত্রকল্প, উপমা, অনায়াস-কথন সঙ্গীতময় কবিতার পঙ্‌ক্তি, সূক্ষ্ম কারুকার্য করা শব্দ এবং পরিমিতিবোধে পরেশ সোমের কবিতা সমৃদ্ধ। চলনে বলনে কবিতায় রহস্যময় মানুষ। স্বভাবতই প্রচুর কবিতা লেখা সত্ত্বেও কোনও কবিতার বই নেই তাঁর।

নীরজ বিশ্বাস

নীরজ বিশ্বাসের জন্ম ২রা জানুয়ারী, ১৯৩৬। দেশের মানুষের সংগে নাটক এবং বিভিন্ন লেখা, মঞ্চ প্রভৃতিতে যোগদান, অভিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির সংগে লেখার যোগাযোগ স্থাপন, অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্যতার বেড়াজালে না জড়িয়ে স্পষ্ট কথন বেশী পছন্দ করেন নীরজ বিশ্বাস। বাংলার আত্মিক দৈন্য, বাঁচার সংগ্রামের এক অস্পষ্ট ছায়া তাঁর মনে পড়েছে কিনা জানি না, তবে নতুন দিগন্তের রামধনু রঙ-এর ছোপ যে তাঁর গায়ে আর কোনওদিন লাগবে না, সে বিষয়ে হলফ করে বলা যায়। ছোটদের লেখায় তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব, নাটক লেখা ও পরিচালনায় যেন এক যাদুকাঠি হাতে। "স্বপ্নের নামে" একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি।

অপরাজিতা গোপ্পী

জন্ম ১৯৩১ সনের ১৬ই জুন। কুচবিহারের পাটাকুড়ায় তাঁর বাড়ি। রাজনীতিতে তিনি এক প্রথম সারির নেত্রী। অল্প বয়স থেকেই কবিতা

লিখে পরিচিত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁরই ফসল "আহত পাখির মতো ডানা ঝাপটায়" কাব্যগ্রন্থ। কবিতা লেখার মেজাজেই ভরপুর তাঁর হৃদয়। রাজনীতি যখন করেন তখন তিনি রাজনীতিতে সুদক্ষ, আবার কোমল সাহিত্যপ্রাণ হৃদয়টি অনুজপ্রতিম কবি-সাহিত্যিকদের কাছেও তাড়িত করে নিয়ে যায়। মেলামেশা তাঁর কাছে বড় নেশা।

রণজিৎ দেব

১৯৪৫-এর অক্টোবরে তাঁর জন্ম ময়মনসিংহ জেলায়। শৈশব কেটেছে কুচবিহারেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ে। শহর থেকে ১২ মাইল দূরে টুপামারী গ্রামে। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাপনেই রণজিৎ দেব অভ্যস্ত। ঋজু ও সহজ বাচনভঙ্গি সুস্পষ্টতর সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরদিকে নিসর্গ চেতনায় লীন, অন্তরের বিষাদ গভীর অনুভূতি গহ্বরে প্রোথিত। অচেনা লোকের মগ্ন অস্তিত্ব প্রেম ও যন্ত্রণায় এই কবির প্রত্যেকটি কবিতাই আলোক-বিন্দুতে স্থিত। নৈরাশ্য তাঁকে কখনো হতাশাগ্রস্ত করেনি। ছন্দ, চিত্রকল্প, প্রকৃতি সৌন্দর্যের ধ্যান-ধারণার সকলই অন্ধকার ও আলোকের সমন্বয়ে মৌল প্রতিন্যাসে বেজে ওঠে।

যুক্তিনিষ্ঠ প্রতীক ভাবনায় স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে অমূর্ত উপলব্ধির জগতে নম্র সঙ্গীতের সুর জাগিয়ে তুলতে ওস্তাদ রণজিৎ দেব। সংবেদনশীল এই কবি শূন্যতার অন্ধকারে আলোকের মহোৎসবে খেলা করেন। অনুভূতি-মালার কাছে বন্দী কবি সর্বদাই নতুন কবিতা লিখতে গিয়ে আলাদা মানুষ হয়ে যান। বয়সে তরুণ এই কবিকে তাঁর কবিতা পাঠ করে অনেকেই বৃদ্ধ বলে ধারণা করেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনকে ভালবেসেই এই কবি সারাটা জীবন কাটাতে চান। বিভিন্ন সংস্থার সংগে জড়িত এই কবি বিভিন্ন হৈ-চৈ-এর মধ্যে সময় কাটালেও অন্তরে যে কবিমন কাজ করে যায় তার তুলনা নেই। উত্তর বাংলার সাহিত্যজগতের তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে পুরোভাগে থেকে কাজ করে চলেছেন ইনি। প্রথম কবিতার বইটি (প্রভু, অন্ধকারে আমি একা) প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে বাংলা কাব্য সাহিত্যে আলোড়ন এনেছে। মিতবাক, প্রচারবিমুখ এই কবি যখন কবিতা

লেখেন, তখন তাঁকে আত্মলীন থাকতে দেখা যায়। কচি ঘাসের ডগায় এক কণা শিশির বিন্দুর মতো রঙের বাহাদুরি খেলিয়ে বিভিন্নভাবে উপলব্ধজগতে অমূর্ত হন।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

চতুর্দিকে অসুস্থ, থমথমে আবহাওয়ায় রুদ্ধ এই কবি, তেজি পঙ্‌ক্তি বিন্যাসে নির্জন গুহার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চান। ঝড়-জল-বজ্র-সন্ধ্যায় আপোষহীন সংগ্রাম মাথা পেতে গ্রহণ করেই যেন এই কবি জন্ম নিয়েছেন ১৩৪৮ সনের ১০ই ফাল্গুন তারিখে। প্রেম ও যন্ত্রণাকাতর হৃদয় সমকোণে বিধৃত হয়ে কখনো বিদ্রোহী ও সোচ্চার কখনো বিষাদ ও বিপন্ন মানসিকতায় উদাসীন। বিশেষত প্রেমের জ্বালা, তীব্র ক্ষোভ, অনুভূতির বিচিত্র যন্ত্রণা কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাড়িত করে নিয়ে বেড়ায়। ঋজু বক্তব্যে এবং অভিজ্ঞতার সমীকরণে যন্ত্রণার যে দীর্ঘ আলাপ করেন অনুভূত চৈতন্যে তা এক নিবিড় নম্র সুরে প্রবাহিত হয় বাংলা কাব্যজগতের স্টান্টবাজীর তলে তলে। পাহাড়ী ঢল প্রেমের কবিতা সংকলনে এই কবির কবিতা তারই সাক্ষ্য বহন করে। কোনরকম অসংলগ্নতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন না কবিতায়, সোজা কথা ও সোজাপথের মানুষ তিনি। সাংসারিক দুঃখ বা দারিদ্র্য এই কবিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

চিন্ময় রায়

আল্ট্রা-মডার্ণ তরুণ কবি এই চিন্ময় রায়। এই কবির কবিতা নৈসর্গিক চেতনার চিত্রিত, বিশাল মরুভূমি থেকে তাড়িয়ে আনেন মরুদ্যানের ঠাণ্ডা হাওয়া, কাব্য জগতের উদ্যান ছুঁয়ে জেগে উঠে শুদ্ধতম চেতনা। কেউ কেউ বড্ড আশাবাদী এই কবি সম্পর্কে।

আশিস নাহা

কলেজে পড়ার পাঠ চোকেনি এখনও। কিন্তু কথায় বার্তায় লেখায় যেন এক বিদগ্ধ পুরুষ। তাঁর প্রবন্ধ এত উঁচুদরের যে বয়স বুঝতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। কবিতার স্বরগ্রামে তাৎক্ষণিক শব্দ প্রয়োগে চমকে দেন। অনেক দুর্বল কবিতাও মেজাজী পঙ্‌ক্তি নির্মাণে উৎরিয়ে দেন এই কবি। এই বয়সে তাঁর এই দিকটাকে অনেকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

জীবতোষ দাস

জন্ম ১৩৫৫ সাল ২৬শে শ্রাবণ। কলেজে পড়তে পড়তেই কবিতা গল্প প্রবন্ধ এন্তার লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। অনবরুদ্ধ আবেগ যখন পঙ্‌ক্তিতে ভাসে ঠিক তখনই ইনি শব্দমালার সমসংযোজনে স্থিরতা আনেন। কবিতার স্মার্টনেসকেই তিনি পছন্দ করেন। তাঁর কবিতা চাপা কৌতুকের বিদ্রূপে শাণিত।

বিমল দেব

জন্ম ১৯৫২ সাল ২২শে সেপ্টেম্বর। সদ্য কলেজ থেকে বেরোলেন এই কবি। প্রেম-যন্ত্রণায় পরিশীলিত এই কবি খুব কম লেখেন। যে কবিতা লেখেন তা ছন্দে, প্রতীকে, সাবলীল কথনে তীব্র বেদনায় চৈতন্যের অভ্যুদয় মেটান। আত্মনিমগ্ন এই কবি বাউলের উদাসী হাওয়ায় একতারার সুরে মনের ভেলা ভাসাতে ভালবাসেন।

শ্যামলী ভট্টাচার্য

স্বপ্নময় গন্ধ বিকেল রঙ। মনে হয় আধ ফোটা সূর্য অন্ধকারকে দুহাতে সরিয়ে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে নাচাচ্ছে। এই কবির জন্ম ১৯৪৭ সালের ২৩শে জানুয়ারী। নিত্যনৈমিত্তিক যে সকল ব্যথা, বেদনা বা দুঃখ তাঁকে ভাবায়,

সেই সকল ব্যথা বেদনাই বড় সিরিয়াসভাবে দেখা দেয় তাঁর কবিতায়। কোনও শব্দ ও ছন্দের কারচুপি করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে তিনি সব-সময়েই নারাজ। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁর কোনও কবিতার বই নেই।

বিপ্লব রুদ্র

বিপ্লব রুদ্রের কবিতা সব সময় প্রকৃতিকে জড়িয়ে। বর্তমান সমাজ ও সমস্যা যে একেবারেই কবিতাকে ছুঁয়ে যায় না তা নয়, কিন্তু প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য বিষয়। নৈসর্গিক চেতনায় স্থিত বলেই তাঁর কবিতার বইয়ের নাম হয়েছে "হিজল বনে বসন্তকাল"। এই কবির জন্ম ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ সাল।

—শাশ্বতী দেব

সাম্প্রতিক কবিতার বই

চারপাশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। হতাশা আর নৈরাজ্য ছেয়ে গেছে আমাদের পরিবেশ। শুভবোধ বা কল্যাণচিন্তা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। দেশ স্বাধীন হয়ে কোথায় আমরা এগিয়ে যাবো তা তো নয়ই অধিকন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে আমরা গা ভাসিয়ে দিয়েছি। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের কৃষ্টি সব যেন শেষ হয়ে গেছে। আমরা এই বর্তমান পরিস্থিতি দেখেও না দেখার ভান করে বসে আছি। এ এক অদ্ভুত সময়। এই পরিস্থিতিতে লেখকদের অগ্নিবর্ষণ হচ্ছে না। ওরা যেন অন্য জগতে বাস করছে। বুঝি বা ওরা ঘর-গেরস্থালী করে না। সমাজে বাস করে না। বাজারে যায় না। এই পরিস্থিতিতে মনের অবস্থা শান্ত নয়। অশান্ত অসুখী মন নিয়ে দিনরাত শেষ হচ্ছে। ভাল লাগে না এই বেঁচে থাকার খেলা খেলতে। এই সময় আমাকে সাহায্য করে কবিতার বই। কবি যারা তারাও সমাজ থেকে দূরে থাকতে চাইছেন। আজকাল আর কবিতায় দেশকাল থাকে না। নিজের আর্তি নিজের সুখ-দুঃখ নিয়েই কবিতার শরীর গড়ে ওঠে। ফলে কবিরা জনসাধারণের উঠোনে যেতে পারেন নি। সেইজন্যই তাদের কবিতা হৃদয় থেকে গড়ে ওঠে না।

প্রথমে সুধীর বেরা'র 'শাহানা' পড়া গেল। কবির কাব্যগ্রন্থ 'লগ্ন' ও সূর্যরাগ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এবং পত্র-পত্রিকায় বিদগ্ধ জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবিতাগুলি সহজ সরল পড়তে গিয়ে কোথাও আটকে যেতে হয় না। ছন্দ মিল ও ছন্দ অমিল কবিতার চেহারা হলেও ভাব-ভাষার দিক থেকে একটি জীবনবোধের সূত্র সবগুলিকে একত্রে যেন গ্রথিত করেছে। এইজন্য পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। কবিতাগুলির শব্দে যেমন সুগভীর ও হতাশার দাম আছে; তেমনই আছে পরম মুহূর্তের আশ্বাস। এই পর্যায়ে আরো দু'জন কবির রচনা পেলাম, আপাতদৃষ্টিতে কবিতাগুলি সরল মনে হলেও একটু তারিয়ে তারিয়ে পড়লে বোঝা যায়। নগরে অরণ্য মনের কবি অতুলরঞ্জন দেব। কবিতা লিখতে জানেন। বইটিতে মোট ৫৬টি কবিতা আছে। অতুলরঞ্জন দেব অনেকদিন থেকে

লিখছেন। লেখক মহলে অপরিচিত নন। অতুলরঞ্জন দেবের কবিতা লিরিক-ধর্মী। ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখতে সিদ্ধহস্ত। একটা উদাহরণ দিই। তোমরা এখানে বসো কাজ নেই পার হয়ে নদী/আমি আগে দেখে আসি, ঋতুরাজ বসন্তের মেলা/ওপারে বসেছে কিনা ; দেখার মতন হয় যদি/তখন তোমরা যেয়ো/এখনো রয়েছে ঢের বেলা। এই রকম বহু লাইন বইটিতে ছড়িয়ে আছে। আমরা আশা করি অতুলরঞ্জন দেব আমাদের আরো নতুন ফসল উপহার দেবেন।

অপরাজিতা গোপ্পী বহু আলোচিত নাম। তার সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আহত পাখির মত ডানা ঝাপটায়' হাতে এল। অনেকদিন পর ভাল লাগা কবিতা পড়া গেল। বারে বারে পড়বার মত কবিতা লিখেছেন—অপরাজিতা গোপ্পী। কবিতাগুলিতে রোম্যান্টিক কবিমনের স্বাক্ষর আছে। কবিতা অন্তর্জীবনের দর্পণ। এই আহত পাখির যন্ত্রণা এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে—বুঝিবা এইজন্যই কবি সার্থক। কি সুন্দর লাইন সমস্ত বেদনা ছাপিয়ে/যে স্মৃতি রেখেছে ভরে মন/সে মন আর কারও নয়/নিঃসঙ্গ একক/জোনাকির মতন। বইটি সংগ্রহ করে সব কবিতাগুলি পড়ে ফেলুন। কাব্যমোদির সেই অনুরোধ করছি। সুধীর বেরা, অতুলরঞ্জন দেব, অপরাজিতা গোপ্পী এই তিনজন কবির থেকে একদম আলাদা মানের কবি—স্নেহকর ভট্টাচার্য, দীপেন রায়। এই দুজন সাম্প্রতিক কবি বয়সে তরুণ তাদের শিল্পকর্মে আধুনিক ধ্যান-ধারণা বিরাজ করছে। স্বভাবতই বিষয় ও মননে তীর্যক। স্নেহকর ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থের নাম তৃষ্ণার তমসা। এই গ্রন্থে ৪৮টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির নির্বাচিত টাটকা কবিতা। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে কবি ভীষণ মনোযোগী এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে তার শিল্পকর্মের অবয়ব তৈরী করেন এইজন্য কবি পাঠকদের কাছে ধন্যবাদার্হ। কেননা আজে-বাজে অনেক কবিতা লিখে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে উজ্জ্বল কবিতা কম লেখা ভাল। এবং স্নেহকর ভট্টাচার্য কম লেখার পক্ষপাতী আমার যতদূর মনে হয়। কবিতাগুলির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ আর্তি খেলছে যা কিনা পাঠককে ভাবায়। ইদানিংকালে খুব কম কবি তাদের লেখাকর্মে পাঠককে ভাবাতে পারেন। যেমন/কে তুমি বিষণ্ণ নারী এমন লাবণ্য নিয়ে এত রাতে জ্যোৎস্নায় একাকী বসে আছো/চারিদিকে অশরীরী ভিড় শব্দ ছায়া। অথবা সারাদিন খুব জ্বর, চোখ লাল, উত্তেজনা

অবসাদ পিপাসা উল্লাস/বমির শুকনো দাগ কস বেয়ে/বাসি মুখে পৃথিবীর প্রতি ধিক্কারে সময় কাটে। অপূর্ব! অনেকদিন মনে থাকবে। রাখাল বালকের সাথে/দীপেন রায় তাঁর সম্প্রতি কবিতা বই এর নাম রেখেছেন। নাম দেখেই কবি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দীপেন রায় মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মানুষের মিছিলে সামিল হয়েছেন। অবশ্য আমি যতদূর জানি সুধীর বেরা, অপরাজিতা গোপ্পীও মানুষের মিছিলে যোগ দিয়েছেন, কেননা তাদের আর একটা জীবন আছে সেটা হচ্ছে রাজনীতি। মানুষের কল্যাণ মানুষের দুঃখ লাঘব করবার জন্যই যেন তারা ঘর বিবাগী হ'য়ে জনসাধারণের একজন হতে চেয়েছেন। কতটা সফল সে কথা বলবো না। তা সময় বিচার করবে। কাব্যগ্রন্থের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা এসে গেল এইজন্য যে, আজকের চার পাশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। হতাশা-নৈরাজ্য ছেয়ে ফেলেছে। এখন লেখার কথা ভাবা যায় না। গল্পের কথা ভাবা যায় না। কবিতার কথা ভাবা যায় না। এই সময় আমি সেই রাজনৈতিক কর্মীর লেখা কবিতা পড়ছি—যদি কিছু পাই। একদম যে নেই তা নয় তবে তা আমার মনকে ভরাতে পারেনি। মানে, আমি যে রকম আগুন চেয়েছিলাম তা পূরণ হয়নি! দীপেন রায়! বয়সে তরুণ। এখনো সময় আছে আমি আশা করবো তাঁর কলমে আগুন ঝরবে। যে আগুনে অন্যায় অত্যাচারের পাহাড়গুলি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অবশ্যি এ সব একান্ত আমার কথা, কেননা আমি আশাবাদী।

—জীবন সরকার

শাহানা/সুধীর বেরা/বাক-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯, আহত পাখির মত ডানা ঝাপটায়/অপরাজিতা গোপ্পী। জয়শ্রী প্রকাশন, কলিকাতা-২৬, নগরে অরণ্য মন/অতুলরঞ্জন দেব/পূর্বাশা প্রকাশন/৩২, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, তৃষ্ণার তমসা/স্নেহকর ভট্টাচার্য/কৃত্তিবাস প্রকাশনী, কলিকাতা-১৭, রাখাল বালকের সাথে/দীপেন রায়/সীমান্ত প্রকাশনী, কলিকাতা-৬।

কবিতা ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

ডিজিটাল লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

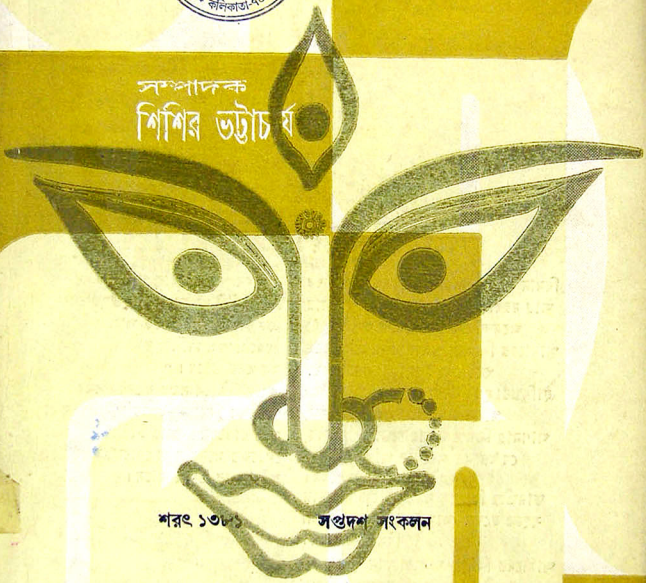

শরৎ ১৩৮১

সপ্তদশ সংকলন